<u>দ্বিতীয় অধ্যায়</u>

রামায়ণ আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্ম

রামায়ণ আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্মগুলি হল—

ক) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর —

১। **ছেলেদের রামায়ণ (১৮৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৭)**

২। **ছোট্ট রামায়ণ (১৯১১)**

খ) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের—

১। **ছোটদের রামায়ণ (১৯১০)**

রামায়ণ আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রামায়ণ আলোচনায় প্রথমে যৌথভাবে আমরা আলোচনা করব গদ্য আকারে লেখা উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছেলেদের রামায়ণ’ ও যোগীন্দ্রনাথের ‘ছোটদের রামায়ণ’ নিয়ে। এবং তারপরে আলোচনা করব পদ্য আকারে লেখা উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছোট্ট রামায়ণ’ নিয়ে।

রামায়ণ কাহিনীকে উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ কীভাবে শিশু রামায়ণ (গদ্যে) হিসাবে গড়ে তুলেছেন তা আমরা আলোচনা করে দেখব তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে, এইভাবে—

ক) রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

খ) রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত/সংকুচিত কাহিনী

গ) রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত/সংযোজিত কাহিনী

মহাকাব্য ‘রামায়ণ’কে ‘ছেলেদের রামায়ণ’ ও ‘ছোটদের রামায়ণ’ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ কোন কোন কাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েছেন, কোন কোন কাহিনীকে আংশিকভাবে বাদ দিয়েছেন আবার কোন কোন কাহিনীকে প্রসারিত করেছেন তা আমরা আলোচনা করব এই অংশে।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব ‘ছেলেদের রামায়ণ’ ও ‘ছোটদের রামায়ণ’ নিয়ে।

রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

আদিকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১।　উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর সূচনাবাক্য হচ্ছে এইরকম—

"অনেকদিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সরযূ নদীর ধারে, অযোধ্যা নগরে তিনি রাজ্য করিতেন।

সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বার ক্রোশ চওড়া ছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল সাজানো থাকিত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী, কেন না তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে একেবারে এক শত লোক মারা পড়ে।

তখনকার অযোধ্যা দেখিতে খুব সুন্দরও ছিল। ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কৃত পথ, ফুলে ভরা সুন্দর বাগান, আর দামী পাথরের সাততলা আটতলা জমকালো বাড়িতে নগরটি ঝলমল করিত।"[১] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

অর্থাৎ, রাজা দশরথ থেকে শুরু। কিন্তু দশরথ আসার আগের ঘটনা অর্থাৎ নারদের সঙ্গে বাল্মীকির কথোপকথন, কামরত অবস্থায় ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চবধ ও তার শোক থেকে বাল্মীকির শ্লোক উচ্চারণ ও বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার রামায়ণ রচনার আদেশ বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান ইত্যাদি সব ঘটনাকেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ' থেকে সম্পূর্ণ ভাবেই বর্জিত করেছেন।

'ছেলেদের রামায়ণ'-এর মত 'ছোটদের রামায়ণ' ও আমরা দেখি যোগীন্দ্রনাথ উক্ত অংশগুলি বাদ দিয়ে শুরু করেছেন অযোধ্যা নগর থেকে রাজা দশরথ থেকে। তবে এখানে সূচনা অংশটি এই রকম—

"সে অনেক দিনের কথা, অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমনই বীর, তেমনই সাধু ও সত্যবাদী। তাঁর রাজধানী অযোধ্যা দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ এবং প্রস্থেও দশ-বারো ক্রোশের কম ছিল না। এত বড় রাজধানীর সমস্তটাই উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এই দেওয়ালের ওপরে সারি সারি অস্ত্র সাজানো থাকত। আর তার বাহিরে চারপাশ ঘিরে গভীর খাত। শত্রুর সাধ্য কী যে অযোধ্যার কাছে আসে।"[২] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

শিশুদের কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন থেকেই হয়তো এই প্রয়াস বা পরিবর্তন। [তবে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে]

২। রামের পিতা দশরথের কাহিনী দিয়ে শিশুপাঠ্য রামায়ণ রচনা শুরু হলেও, দশরথের বিস্তৃত বংশ পরিচয়ের কথা ছেলেদের ও ছোটদের উভয় রামায়ণ থেকেই সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে। আসলে বিস্তৃত বংশ পরিচয় শিশুদের তেমন কোন আনন্দ দেবে না বরং এটি তাদের কাছে আরও জটিল হয়ে যাবে। তাছাড়া মূল রামায়ণ কাহিনীকে জানার জন্য এই বংশ পরিচয়ের প্রয়োজনও নেই।

৩। তারকা রাক্ষসীকে বধের পর সিদ্ধাশ্রমের যুদ্ধ শেষে, বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় যজ্ঞে যোগদানের জন্য এবং

মিথিলার রাজা জনকের পূর্বপুরুষের বিখ্যাত ধনুক দেখানোর জন্য মিথিলার পথে যাত্রা করলে পথ মধ্যে যে সমস্ত জায়গা পরে তার বর্ণনা ও ইতিহাস বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে বলেন। যেমন—প্রথম রাত্রে, শোন নদীর তীরে অবস্থিত দেশের রাজার কথা—রাজা কুশ ও তার পুত্র গাধির কথা বলেন। যাঁরা ছিলেন বিশ্বামিত্রেরই পূর্বপুরুষ। দ্বিতীয় রাত্রে, শোন নদীর তটদেশ অতিক্রম করে জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হলে, যেখানকার বৃত্তান্ত অর্থাৎ গঙ্গার উপাখ্যান, কার্তিকেয়র জন্ম, রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সগর রাজার উপাখ্যান এবং তার পরবর্তী বংশধর—সগর—অংশুমান—দিলীপ—ভগীরথের কথা এবং ভগীরথের গঙ্গানয়নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তারপর তৃতীয় রাত্রে, বিশাল নগরে আসলে সেখানকার বৃত্তান্ত অর্থাৎ ক্ষীরোদমন্থন, মারুতগনের উৎপত্তি ইত্যাদির কথা বর্ণনা করেন এবং চতুর্থ দিনে, মিথিলায় প্রবেশ করেন কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তাদের রামায়ণে এইসব জায়গার বর্ণনা এবং ইতিহাস কিছুই বলেন নি শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করে গেছেন—

"সেদিনকার রাত্রিতে তাঁহারা শোণ নদের ধারে আসিয়া রহিলেন। তাহার পরের রাত্রি গঙ্গার ধারে, তাহার পরের রাত্রি বিশাল নগরে কাটিল। চারি দিনের দিন সকালবেলায় তাঁহারা দূর হইতে মিথিলার সুন্দর রাজপুরী দেখিতে পাইলেন।"[৩] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য নামও উল্লেখ করেন নি—

"বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ শেষ হলে, তিনি রাম, লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় জনক রাজার যজ্ঞ দেখতে চললেন। যেতে যেতে পথে সন্ধ্যে হল, তাঁরা এক নদীর তীরে রাত্রি যাপন করলেন। পথে আরও দু-রাত্রি কাটিল। পরদিন সকালে তাঁরা চলতে আরম্ভ করে একটু পরেই দূর থেকে জনক রাজার রাজধানী মিথিলা নগর দেখতে পেলেন।"[৪] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৪। অহল্যার শাপমোচনের খবর শুনে জনক রাজার পুরহিত তথা গৌতম-অহল্যার বড় ছেলে শতানন্দ মুনি খুশি হয়ে রামকে অনেক স্নেহ করেন এবং তাদেরকে অনেক পূর্ব কাহিনীর কথা শোনান। যেমন—রামের রক্ষক অমিততেজা বিশ্বামিত্রের ইতিহাস, ইক্ষাকুবংশের পূর্বপুরুষ রাজা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গারোহনের কাহিনী, মহর্ষি ঋচিকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেপের উপাখ্যান ইত্যাদি। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর শতানন্দের সঙ্গে রামের এই সব গল্পের কথা উল্লেখ করেন নি। শুধু শতানন্দ মুনি ও তার সুখের কথা ব্যক্ত করেছেন—

"জনকের পুরোহিত শতানন্দ মুনি গৌতমের বড় ছেলে। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতা আবার ভাল হইয়াছেন, তখন তাহার মনে কী সুখই হইল। তিনি রামকে কতই স্নেহ দেখাইলেন আর বিশ্বামিত্রের কত প্রশংসা করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্রই রামকে আনিয়া তাঁহার মায়ের দুঃখ দূর করিয়াছেন।"[৫][উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

আর যোগীন্দ্রনাথ শতানন্দমুনির কোন কথা উল্লেখ করেন নি, তবে অহল্যার শাপমোচনের কথা যথার্থ ভাবেই উল্লেখ করেছেন— "বিশ্বামিত্রের কথায় রাম অহল্যাকে দেখতে চললেন। অহল্যা পাথর হয়ে ছিলেন। পাষাণী অহল্যা এতদিন একমনে যাঁর তপস্যা করছিলেন, আজ সেই রামের দেখা পেয়ে শাপমুক্ত হলেন। রাম তাঁকে দেখে পায়ের ধুলা নিলেন; আবার তিনিও রামের পূজা করলেন।"[৬][যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৫। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ছেলেদের রামায়ণে প্রথম কান্ডের নাম বাল্মিকী রামায়ণের নামানুসারে 'বালকান্ড' রাখেন নি।

তিনি প্রথমকান্ডের নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণের নামানুসারে ‘আদিকান্ড’ রাখেন।

অযোধ্যাকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১। রামের বনবাস যাত্রার সময় রামের রথের পিছন পিছন অযোধ্যার লোকেরা যে তমসা নদীর তীর পর্যন্ত এসেছিলেন এবং রাত্রি শেষে ভোরে রাম তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যান এই ঘটনা উপেন্দ্রকিশোর তাঁর রামায়ণে উপস্থাপন করলেও যোগীন্দ্রনাথ তাঁর রামায়ণ থেকে সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করেন।

২। বনবাস থেকে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি যে সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ উপদেশ রামকে দেন, অর্থাৎ— “রাঘব, অশিক্ষিত জনের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন নিরর্থক না হয়। কে কার বন্ধু, কে কার কাছ থেকে কিছু পায়? জীব একাকী জন্মায়, একাকী মরে, অতএব মাতা-পিতার প্রতি যে আসক্ত হয় সে উন্মত্ত। পিতৃ-রাজ্য ত্যাগ ক'রে দুঃখময় অরণ্যে বাস করা তোমার উচিত নয়। তুমি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজভোগ উপভোগ কর।... পিতৃশ্রাদ্ধে কেবল অন্নের নাশ হয়, মৃত ব্যক্তি কখনও আহার করতে পারে? চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে— যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর, ত্যাগ কর, ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জন-সাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই বুদ্ধি হ'ক যে পরলোক নেই। যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদ্‌যোগী হও, যা পরোক্ষ তা পরিহার কর। তুমি সর্বসম্মত সদ্‌যুক্তি অনুসারে ভরতের সমর্পিত রাজ্য গ্রহণ কর।”[৭] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এই উপদেশের সমস্তই উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তাঁদের রামায়ণ থেকে পরিত্যাগ করেছেন। [কিন্তু কেন করেছেন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে]

৩। বশিষ্ঠ রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে উপদেশ দেন, অর্থাৎ—

“রামকে ক্রুদ্ধ দেখে বশিষ্ঠ বলেন, লোকের পরলোকগতি এবং পুনর্জন্মের বিষয় জাবালি ভালই জানেন, কেবল তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য ওই সকল কথা বলেছেন।... ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হয়ে থাকেন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অভিষেক হয় না, তুমি এই কুলধর্ম নষ্ট করো না। আমি তোমার পিতার এবং তোমার আচার্য, আমার কথা রাখলে তোমার সদ্‌গতি হবে।[৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এই কথা যোগীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন আর উপেন্দ্রকিশোর সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেও বলেছেন এইরকম ভাবে—

“বশিষ্ঠও নানারূপ মিষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। জাবালি নামক আর একজন পুরোহিত তাঁহার সহিত রীতিমত তর্কই জুড়িয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলকেই তাঁহার নিকট হার মানিতে হইল।”[৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

অরণ্যকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১। রাম বনমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চাপ্সর সরোবরে পৌঁছলে, ধর্মভৃত মুনি এই স্থানের যে বৃত্তান্ত রামকে বলেন তা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই সম্পূর্ণই পরিহার করে গেছেন। বৃত্তান্তটি এইরকম— “সেই তড়াগ এক যোজন বিস্তৃত, তার জল অতি নির্মল, ভিতর থেকে গীতবাদ্যের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রাম জিজ্ঞাসা করলে ধর্মভৃত্ত

নামে এক মুনি বললেন, এর নাম পঞ্চাপ্সর সরোবর। মহামুনি মান্ডুকর্ণি এই জলাশয়ের মধ্যে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর বিঘ্ন করবার জন্য দেবগণ পাঁচজন বিদ্যুৎকান্তি অপ্সরা পাঠিয়ে দেন। মান্ডুকর্ণি তাদের বিবাহ করলেন। এই সরোবরের জলমধ্যে এক গৃহ নির্মাণ করে তিনি এখন পঞ্চপত্নীসহ সেখানে বাস করছেন। তোমরা সেই অপ্সরাদের সংগীত শুনছ।"[১০] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি-রামায়ণ সারানুবাদ]

২। মহাপরাক্রমশালী অগস্ত্য মুনির নানা বিচিত্র ধর্মকাণ্ডের কথা তথা ইম্বল-বাতাপির কথা উপেন্দ্রকিশোর বললেও অগস্ত্য মুনির অন্যান্য কীর্তি, যেমন—

"বিন্ধ্য পর্বত সূর্যের পথরোধ করবার জন্য বর্ধিত হচ্ছিল, কিন্তু অগস্ত্যের আদেশে তাকে নিরস্ত হ'তে হয়েছে।"[১১] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি-রামায়ণ]

—এই কথা উপেন্দ্রকিশোর উল্লেখ করেন নি আর যোগীন্দ্রনাথ অগস্ত্যমুনির কথা বললেও তাঁর কোন অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন নি।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সূচনাতে পম্পা নদীর তীরবর্তী যে মনোরম সুন্দর অঞ্চলের বর্ণনা করা হয়েছে যার শোভা রামকে মুগ্ধ করে ও যার প্রকৃতিস্থ রূপ রামকে সীতাসংসর্গের কথা মনে করিয়ে দেয় সেইসব বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণই বাদ দিয়েছেন, উভয়েই শুরু করেন পম্পা নদী পার হয়ে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে। উপেন্দ্রকিশোরের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সূচনা বাক্যটি এই রকম—

"পম্পা নদী পার হইলে ঋষ্যমূক পর্বত। সেই ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে বানরদিগের রাজা সুগ্রীব আর কয়েকটি বানর সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল যে, দুইজন মানুষ সেই দিকে আসিতেছে।"[১২] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

আর যোগীন্দ্রনাথের সূচনা অংশটি এইরকম—

"রাম-লক্ষ্মণ পম্পা নদী পার হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এখানেই বানর-রাজ সুগ্রীব থাকতেন। এই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই। সুগ্রীবের প্রতি বালীর অত্যাচারের কথা বলে শেষ করা যায় না। কখন বালী তাঁকে মেরে ফেলে সেই ভয়ে সুগ্রীব এই পর্বতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।"[১৩] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। বালীর সঙ্গে মায়াবী রাক্ষসের যুদ্ধের বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর করলেও, কী কারণে মায়াবী রাক্ষসের সাথে বালীর যুদ্ধ হয় সেই সম্পর্কে কিছু বলেন নি। কারনটি হল—

"মায়াবী নামে এক তেজস্বী অসুর ছিল, সে দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্ত্রী ঘটিত কোনও ব্যাপারে বালীর সঙ্গে তার শত্রুতা হয়।"[১৪] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য এইসবের কিছুই উল্লেখ করেন নি।

৩। সুগ্রীব দ্বিতীয়বার রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় বনের মধ্যে সপ্তঋষির যে ঘন বন ও সপ্তঋষির যে বর্ণনা আছে, তা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের রামায়ণে অনুপস্থিত। সপ্তঋষির বর্ণনা

রাজশেখর বসুর রামায়ণে এই রকম—

"রামের প্রশ্নের উত্তরে সুগ্রীব বললেন, এখানকার আশ্রমে সপ্তজন নামক সাঁত জন ঋষি বাস করতেন, তাঁরা অধঃ শিরা হয়ে নিয়ত জলে শয়ন করতেন এবং সপ্ত রাত্রি অন্তর বায়ু মাত্র আহার করতেন। তাঁরা শতবৎসর তপস্যার পর সশরীরে স্বর্গে গেছেন। তাঁদের তপস্যার প্রভাবে এই তরুবেষ্টিত আশ্রম সুরাসুর পক্ষী ও বনচরগণের অগম্য হয়ে আছে, কেউ যদি মোহবশে প্রবেশ করে তবে আর ফেরে না। এখানে ভূষণের নিক্কণ, মধুর কণ্ঠস্বর, তূর্যধ্বনি ও গীত শোনা যায়, দিব্য গন্ধও পাওয়া যায়।"[১৫] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৪। সুগ্রীবের রাজ্যলাভের পর সীতার অন্বেষণে যুদ্ধ যাত্রা শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু এই সময় বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় শরৎকাল না আসা পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই বর্ষা ঋতুতে রামের সীতা বিরহের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ষা ঋতুর চমৎকার বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণই পরিহার করে গেছেন। বর্ষা ঋতুর বর্ণনা এই রকম—

"রাম মাল্যবান পর্বতে গিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন,

অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ সময়োহদ্য জলাগমঃ।

সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ।।

নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।

পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্।।

শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ।

কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ।। (২৮/২-৪)

এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।

সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।। (২৮/৭)

—দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হয়েছে, পর্বততুল্য মেঘে নভোমন্ডল আবৃত। সূর্যরশ্মিদ্বারা সমুদ্রের রস পান ক'রে আকাশ ন মাস গর্ভধারণ করেছিল, এখন জলরূপ রসায়ন প্রসব করছে। এই মেঘের সোপানপঙ্‌ক্তি দিয়ে আকাশ উঠে কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের মালায় সূর্যকে অলংকৃত করা যেতে পারে। পৃথিবী সূর্যতাপে পরিক্লিষ্ট ছিলেন, এখন নব বারিপাতে সিক্ত হয়ে যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পমোচন করছেন।"[১৬] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৫। বর্ষাকাল পার হয়ে শরৎকাল চলে আসার পরও সুগ্রীব আসক্তিতে মত্ত থেকে সীতা অন্বেষণে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি না নেওয়ায় রাম দুঃখিত ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠায় সুগ্রীবকে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য—

"তারপর রাম বললেন, এই সময়ে রাজারা শত্রু জয় করবার জন্য যাত্রা ক'রে থাকেন, কিন্তু সুগ্রীবের কোনও উদ্‌যোগ দেখছি না। আমি অনাথ, রাজ্যচ্যুত, রাবণকর্তৃক ধর্ষিত, গৃহহীন দরিদ্র এবং তার শরণাপন্ন, এই কারণেই বোধ হয় দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে অবহেলা করে। সীতার অন্বেষণের জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু নিজে কৃতকার্য হয়ে এখন সে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। লক্ষ্মণ, তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সেই গ্রাম্যসুখে আসক্ত মূর্খ সুগ্রীবকে বল—পূর্বোপকারীকে প্রতিশ্রুতি

দিয়ে যে রক্ষা না করে সে পুরুষাধম।"[১৭] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এই ঘটনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই তাদের রামায়ণ থেকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন।

৬। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় আসার পর যখন দেখেন সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি পালন ভুলে মদবিহ্বল হয়ে কামভোগে মত্ত, তখন লক্ষ্মণ গর্জে উঠলে সুগ্রীব নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং যুদ্ধযাত্রা প্রস্তুতিতে সচেষ্ট হন—

"লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হয়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন। লক্ষ্মণকে দেখে তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মণ বললেন, যে অধার্মিক রাজা উপকারী মিত্রের কাছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তার চেয়ে নৃশংস কেউ নেই। পূর্বোপকার বিস্মৃত হয়ে যে প্রত্যুপকারে বিমুখ হয় সেই কৃতঘ্নকে বধ করা উচিত।"[১৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এই সব ঘটনাকে উপেক্ষা করে একেবারে সীতা অন্বেষণের প্রস্তুতিতে চলে গেছেন—

"বালীর মৃত্যুর পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা আর অঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। তারপর সীতাকে খুঁজিবার আয়োজন হইতে লাগিল।"[১৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন—

"এরপর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ও অঙ্গদকে যুবরাজ করলেন। এখন সুগ্রীব আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। পৃথিবীর যেখানে যত বানর ছিল, দূত পাঠিয়ে তিনি সকলকে কিষ্কিন্ধ্যায় জড়ো করলেন। তারপর বড়ো বড়ো সাহসী বানর পাঠিয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—চারদিকে সীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।"[২০] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

সুন্দরকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১। হনুমানের সঙ্গে সীতার দেখা হওয়ার যথার্থ অভিজ্ঞান হিসেবে সীতা হনুমানকে চিত্রকূট পর্বতের যে কাহিনী বলেন তা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। কাহিনীটি হল—

"একদিন চিত্রকূট পর্বতের উপবনে জলক্রীড়ার পর আমরা আর্দ্রদেহে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক বায়স আমাকে চঞ্চুদ্বারা আক্রমণ করলে। আমি লোষ্ট্র তুলে তাকে নিবারণের চেষ্টা করি, তথাপি সে নিরস্ত হ'ল না। আমার স্খলিত বসন দেখে তুমি হেসেছিলে, তাতে আমার ক্রোধ আর লজ্জা হয়। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিলে, আমি শ্রান্ত হয়ে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত রইলাম। তারপর আমি জাগ্রত হ'লে সেই বায়স আবার এসে আমার স্তন বিদীর্ণ ক'রে দিলে। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে চারিদিকে চেয়ে সেই কাককে দেখতে পেলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, তার গতি বায়ুর তুল্য। তখন তুমি একটি তৃণ নিয়ে মন্ত্রদ্বারা তাতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করলে এবং সেই জ্বলন্ত তৃণ কাকের প্রতি নিক্ষেপ করলে।"[২১][রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

লঙ্কাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

১। রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞা মাল্যবাণ রাবণকে যে উপদেশ দিয়েছিল অর্থাৎ রামের সঙ্গে সন্ধি করার উপদেশ এবং আরও অনেক সৎপরামর্শ। মাল্যবানের সঙ্গে রাবণের এই কথোপকথোন উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন—

"রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান বললেন, যে রাজা বিদ্যাবান ও নীতিপরায়ণ তিনি ঐশ্বর্যশালী হন, শত্রুও শাসন করেন। রাজা যদি শত্রুর অপেক্ষা অধিক বলশালী হন তবেই যুদ্ধ করতে পারেন, যদি হীনবল বা তুল্যবল হন তবে সন্ধি করাই কর্তব্য। রাবণ, রামের সঙ্গে সন্ধি করাই আমি ভাল মনে করি, সীতাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি ত্রিলোকে বিচরণকালে ধর্ম বিনষ্ট ক'রে অধর্ম আশ্রয় করেছ, সেজন্যই তোমার শত্রুরা প্রবল হয়েছে।[২২] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

'ছোটদের রামায়ণ' এর উত্তরাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে পূর্ণ বর্জিত কাহিনী

'রামায়ণ' এর উত্তর কান্ড থেকে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছোটদের রামায়ণ' এর উত্তর কান্ডটিকে অনেকটাই ছোট করে উপস্থাপন করেছেন। উত্তরকান্ডের অন্যান্য সকল কাহিনীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রাম-সীতা সম্পর্কিত কাহিনীটিকেই যোগীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। পূর্ণ বর্জিত কাহিনী গুলি হল—

১। রাক্ষসবধের পর রাম রাজ্যলাভ করলে রামের সভায় সপ্তর্ষিগণের সমাগমের কথা যোগীন্দ্রনাথ বলেন নি।

২। এই ঋষিগণ পূর্বের যে সমস্ত কাহিনী শোনান অর্থাৎ রাক্ষসদের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, রাবণাদির পূর্ব বৃত্তান্ত, রাবণের কুবের জয় ও মহাদেবের বর, মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম ও লঙ্কাপুরীতে রাক্ষস রাজ্য স্থাপন, বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান, রাবণের যমলোকে অভিযান ও রাবণের নিকট যমের পরাজয়, রাবণের বরুণপুরী বিজয়, বালির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা, রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক জয়, রাবনের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব, রাবণের হাতে সূর্পনখার বৈধব্য, রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়, হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত ইত্যাদির কাহিনী যোগীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তাঁর 'ছোটদের রামায়ণ' এর উত্তরাকান্ড থেকে বাদ দিয়েছেন।

রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত/সংকুচিত কাহিনী

আদিকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত বা সংকুচিত কাহিনী

১। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, উপেন্দ্রকিশোর ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যানকে অনেক ছোট করে ও শিশুসুলভ করে বলেছেন। মূল রামায়ণের বালকাণ্ডে ঋষ্যশৃঙ্গের যে উপাখ্যান আছে তা পরিণত বয়স্ক মানুষের জন্য। সেই কাহিনীকে তিনি চমৎকার শিশু সুলভ করে উপস্থাপন করেছেন। যাতে শিশুদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়—

"মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়া আসুন। তিনি যজ্ঞ করিলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে।' এই মুনির হরিনের মত শিং ছিল, তাই লোক তাঁহাকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিত। এমন ভাল মুনি কমই দেখা গিয়াছে।

মন্ত্রীদিগের কথা শুনিয়া দশরথ বলিলেন, 'বড় ভাল কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ যে আমার জামাই হন, কারন তিনি আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমি নিজেই তাঁহাকে আনিতে যাইব।'

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া আসিলেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল।"[২৩] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

আবার এই কাহিনীকে যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন এইরকম ভাবে—

"এখন যজ্ঞ করবার উপযুক্ত একজন পুরোহিত চাই। মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গ এই কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। আপনি তাঁকে এনে যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।'

মহারাজ দশরথ তাঁদের কথায় বড়োই আনন্দিত হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে থাকতেন। তিনি দশরথ বন্ধু লোমপাদ রাজার জামাতা। তাই দশরথ বললেন, 'ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আমার বন্ধু রাজা লোমপাদের জামাতা, তাঁকে আমি নিজেই আনতে যাব। আপনারা এখন সরযূ নদীর তীরে যজ্ঞশালা নির্মানের ব্যবস্থা করুন....।"[২৪] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ কি উপায়ে লোমপাদের জামাতা হয়েছেন সেই বর্ণনা, অর্থাৎ—

"ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি নগর বা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ কিছুই দেখেন নি। মন্ত্রীদের প্রেরিত বেশ্যারা আশ্রমের নিকট অবস্থান করছিল। ....তারা আশ্রমে এলে ঋষিকুমার তাদের সমাদর ক'রে বললেন, এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই আমাদের ফলমূল। বারাঙ্গনারা অতি উৎসুক হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের পূজো নিলে.... তারা বললে,

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ।

গৃহাণ বিপ্র ভদ্রাং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্।।

ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমান্বিতাঃ।

মোদকান্ প্রদদুস্তটস্ম ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ শুভান্।। (১০/১৯-২০)

—হে দ্বিজ, আমাদেরও এই সব উত্তম ফল গ্রহণ করুন, আপনার ভাল হবে, শীঘ্র খেয়ে ফেলুন। তার পর তারা হৃষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন ক'রে মোদক এবং বিবিধ উত্তম খাদ্য দিলে।

বারাঙ্গানারা চ'লে গেলে ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হলেন এবং ....তারাও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নগরের অভিমুখে যাত্রা করলে।

ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহসা প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। ....তারপর তাঁকে অন্তঃপুরে এনে নিজ কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করলেন।"[২৫] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এই বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন, কারণ এই বিষয়ে শিশুরা প্রশ্ন করলে তাদের উত্তর দেওয়া ও তাদের উত্তর বোঝা কোনটাই সহজ হবে না।

২। অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়মাবলীর অন্যান্য সব কথা বললেও অশ্বমেধ যজ্ঞে রানীদের যে ভূমিকা আছে, অর্থাৎ—

"কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।

কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা।।

পতিত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।

অবসদরজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্মকাম্যয়া।।

হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।

মহিষ্যা পরিবৃক্ত্যাথ বাবাতাম পরাং তথা।। (১৪/৩৩-৩৫)

— কৌশল্যা সেই অশ্বের সম্যক পরিচর্যা ক'রে পরম আনন্দে তিন খড়্গাঘাতে তাকে বধ করলেন। তার পর তিনি ধর্মকামনায় সুস্থির চিত্তে সেই অশ্বের সঙ্গে এক রজনী যাপন করলেন। হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতা রাজার মহিষী ও পরিবৃক্তিসহ বাবাতা ও অপরা পত্নীকে অশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।"[২৬] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এই বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে পরিহার করে গেছেন। অথচ অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা করেন সাবলীল ভাবেই।

৩। তাড়কা রাক্ষসীর কথা তথা তাড়কা বধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও অগস্ত্যের উপর তাড়কার রাগের কারণ বা তাড়কার পূর্ব বৃত্তান্ত উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ কেউই তাদের রামায়ণে উল্লেখ করেন নি। তাড়কার পূর্ব বৃত্তান্তটি ছিল এই রকম—

"পূর্বে সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। ...ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কন্যা দিয়া উহার দেহে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন।

অনন্তর তাড়কা যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। ...তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে।...

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জনগর্জনপূর্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতুসুতাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষা লোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মনুষ্য ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুন রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে।"[২৭] [হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অনুবাদিত) /বাল্মীকি রামায়ণ]

৪। রাম কর্তৃক অহল্যার শাপ মোচনের কথা ছেলেদের ও ছোটদের উভয় রামায়ণেই আছে কিন্তু অহল্যার অপরাধের কথা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ কেউই উল্লেখ করেন নি। অহল্যার অপরাধ হল—

"একদা তিনি অন্যত্র গেলে শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ ক'রে অহল্যার কাছে এসে সংগম প্রার্থনা করলেন। গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও অহল্যা দুর্মতিবশে সম্মত হলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রকে বললেন,

কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।।

আত্মানং মাং চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ। (৪৮/২০-২১)

—সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হয়েছি, শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যান, নিজেকে এবং আমাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবেন।... এমন সময় অনলতুল্য তেজস্বী গৌতম স্নান ক'রে সমিধ নিয়ে ফিরে এলেন। গৌতম বললেন, ওরে দুর্মতি, আমার রূপ ধারণ করে যে অকর্তব্য কর্ম করেছ তার জন্য তুমি নপুংসক হবে।... তারপর গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, দুষ্টচারিণী, তুমি এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্য হয়ে বায়ুমাত্র ভক্ষণ ক'রে অনাহারে ভস্মশর্য্যায় বহু সহস্র বৎসর অনুতাপ করবে।[২৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

অযোধ্যাকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে সংকুচিত বা আংশিক বর্জিত কাহিনী

১। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আগে দশরথ যে অশুভ স্বপ্ন দেখেছিলেন যার ফলে তিনি রামের অভিষেক চৈত্র মাসের পরিবর্তে পরের দিনই করার জন্য মনস্থির করেন, সেই অশুভ স্বপ্নের কথা এবং সেই অশুভ স্বপ্নের ফলে দশরথের মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়েছিল অর্থাৎ— "আজ আমি অশুভ স্বপ্ন দেখেছি, যেন দিবসে বজ্রনির্ঘোষ সহ উল্কাপাত হচ্ছে। দৈবজ্ঞেরা বলেছেন, সূর্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহে আমার জন্মনক্ষত্র আক্রান্ত হয়েছে। এই প্রকার দুর্লক্ষণ প্রায় রাজার ঘোর বিপদ ও মৃত্যু সূচনা করে। আমার বর্তমান সংকল্প থাকতে থাকতেই তুমি অভিষিক্ত হও, কারণ মানুষের মতির স্থিরতা নেই।"[২৯] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

— এইসব কথা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ তাঁদের রামায়ণে কিছুই উল্লেখ করেন নি। এই ঘটনাটি উপেন্দ্রকিশোর বলেন এইরকম ভাবে—

"স্থির হইল যে, পরদিনই রামকে যুবরাজ করা হইবে।"[৩০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

আর যোগীন্দ্রনাথ বলেন আরও সংক্ষেপে—

"একদিন রাজসভায় রাজা তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সকলেই আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। রামের অভিষেকের দিন স্থির হয়ে গেল।"[৩১] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। কৈকেয়ীর অন্যায় আবদারের কথা শুনে লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে যে দুর্ব্যবহার করেন তা উপেন্দ্রকিশোর তুলে ধরেছেন মানবিকতার নানান রঙের সঙ্গে মিশিয়ে। যোগীন্দ্রনাথও খানিকটা সেই রকমই করেছেন। যেমন রামের বনবাসের কথা শুনে লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেন তা হল এই রকম—

"দেবী কৌশল্যা আমার পরাক্রম দেখুন, রাঘবও দেখুন—আমি বৃদ্ধ পিতাকে হরণ করব, যিনি কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তির ফলে হীন হয়েছেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বালস্বভাব পেয়ে গর্হিত আচরণ করছেন।"[৩২] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোর যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা হল এই রকম—

“কৌশল্যার দুঃখ দেখিয়া লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ‘মা, দাদা কিসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজ এখন বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্ত্রীর কথায় ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন? এমন রাজার কথা না শুনিলে কী হয়?”[৩৩] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী/ছেলেদের রামায়ণ]

আর যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন এই রকম ভাবে—

“লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার দেখে ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় বুদ্ধিহীন হয়েছেন বলে পিতার নিন্দা করতে লাগলেন। রামকে বললেন, ‘দাদা এমন অবিচার সহ্য করা অন্যায়।”[৩৪] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৩। বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞের স্ত্রীকে সীতা বনবাস যাত্রা কালে যে সমস্ত ধন সম্পদ দান করেন তা উপেন্দ্রকিশোর উল্লেখ করেন নি, তবে বুড়ি ত্রিজটাকে যে পদ্ধতিতে রাম সহস্র গরু দান করেন তা যথার্থ রঙ্গ-রসিকতা পূর্ণ করেই উপস্থাপন করেন। অবশ্য যোগীন্দ্রনাথ এই দান-ধ্যান ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেন নি।

৪। রামের বনবাস যাত্রাকালে সুমন্ত রাগে অভিভূত হয়ে গিয়ে কৈকেয়ীকে যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বাক্য বলেন তা উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই পরিহার করেছেন।

অরণ্যকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে সংকুচিত বা আংশিক বর্জিত কাহিনী

১। বিরাধ রাক্ষসের সাথে রামের যুদ্ধের বর্ণনা, বিরাধ রাক্ষসের সীতাকে নিয়ে পালানো ইত্যাদি কথা উপেন্দ্রকিশোর তার রামায়ণে উল্লেখ করেছেন—

“সে জলযোগে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না, যদি হতভাগা সীতাকে লইয়া ছুট না দিত।”[৩৫] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

কিন্তু বিরাধ রাক্ষসের সীতাকে ভার্যা হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্খা—

“আমি বিরাধ রাক্ষস, এই দুর্গম বনে সশস্ত্রে বিচরণ করি, নিত্য ঋষিমাংস খাই। এই বরারোহা নারী আমার ভার্যা হবে।... ব্রহ্মার বরে আমাকে কেউ অস্ত্রে ছেদন ক’রে মারতে পারবে না, অতএব তোমরা এই নারীর আশা ত্যাগ করে শীঘ্র দূর হও।”[৩৬] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

— এইসব কথা উপেন্দ্রকিশোর তাঁর রামায়ণে উল্লেখ করেন নি। আর যোগীন্দ্রনাথ বিরাধ রাক্ষসের কোন প্রসঙ্গই তার রামায়ণে উল্লেখ করেন নি, তিনি অরণ্য কাণ্ডের বর্ণনা শুরু করেছেন অগস্ত্য মুনির প্রসঙ্গ থেকে।

২। বিরাধ রাক্ষসের পূর্ব কাহিনী অর্থাৎ কুবেরের দ্বারা বিরাধের শাপের কথা উপেন্দ্রকিশোর বলেন—

“তখন রাক্ষস বলিতে লাগিল, ‘বুঝিয়াছি, আপনারা রাম লক্ষ্মণ। আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব ছিলাম, কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছি।”[৩৭] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

কিন্তু বিরাধের অপরাধের কথা অর্থাৎ রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে কর্তব্যকালে অনুপস্থিত থাকার ফলে কুবের তাকে যে অভিশাপ দিয়েছিল, অর্থাৎ—

"আমি তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব, রম্ভার প্রতি আসক্তির জন্য কর্তব্যকালে অনুপস্থিত ছিলাম, সে কারণে কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছি।"[৩৮] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদি) / বাল্মীকি রামায়ণ]

— এই কথা কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর বলেননি শুধু কুবের কতৃক শাপের কথাই বলেছেন।

৩। জটায়ু রামকে নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় সৃষ্টির আদিকালের যে চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেন—

"পক্ষী মধুর বাক্যে উত্তর দিলে, বৎস, আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম তখন তাকে অভিনন্দন ক'রে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

পক্ষী বললে, প্রথম প্রজাপতির নাম কর্দম, তার পর বিকৃত প্রভৃতি দ্বাদশ জন, তার পর দক্ষ, বিবস্থান, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। দক্ষের ষাট কন্যা, কশ্যপ তাঁদের আটটিকে বিবাহ করেন— অদিদি দিতি দনু কালকা তাম্রা ক্রোধবশা মনু ও অনলা। অদিতির গর্ভে আদিত্য বসু রুদ্র অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশ 'দেবতা, এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। বন ও সাগর সমেত এই বসুমতী পুরাকালে দৈত্যগণের অধিকৃত ছিল। দনু থেকে অশ্বগ্রীব, কালকা থেকে নরক ও কালক, এবং তাম্র থেকে ক্রৌঞ্চী শুর্ক প্রভৃতি পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। শুকীর কন্যা নতা, নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশার গর্ভেও মৃগী প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মায়। কশ্যপের এইসকল দুহিতা ও দৌহিত্রী থেকে নানাজাতীয় পক্ষী পশু সর্প ও মনুষ্য উৎপন্ন হয়েছে। শুকীর দৌহিত্রী বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। আমি অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু। আমার অগ্রজের নাম সম্পাতি। বৎস, তুমি যদি চাও তবে এই বনে আমি তোমার সহায় হব, তুমি আর লক্ষ্মণ অন্যত্র গেলে আমি সীতাকে রক্ষা করব।"[৩৯] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদিত/ বাল্মীকি রামায়ণ]

—উপেন্দ্রকিশোর এই কাহিনী পরিহার করেছেন। শুধু জটায়ুর সঙ্গে রামের পরিচয় ও সীতা রক্ষার কথা বলেছেন—

"বাবা, আমি তোমাদের পিতার বন্ধু। আমার নাম জটায়ু। আমার দাদার নাম সম্পাতি, আমার পিতার নাম অরুণ। গরুড় আমাদিগের জ্যেঠামহাশয়।'

পাখি আরও বলিল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এইখানে থাক; তাহা হইলে তোমরা যখন ফল আনিতে যাইবে তখন আমি সীতাকে দেখিতে পারিব।' রাম লক্ষ্মণ তাঁহাতে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কথাবার্তা তাঁহাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল।"[৪০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথও প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই করেছেন— "পঞ্চবটী বনে জরায়ু পক্ষী বাস করত। দশরথের সঙ্গে তার খুবই বন্ধুত্ব ছিল। পক্ষীর সঙ্গে পরিচয় হলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাকে প্রণাম করলেন। জটায়ু খুশি হয়ে বলল, 'তোমরা এইখানেই থাকো। আমি বুড়ো হয়েছি, তথাপি যতটুকু পারি তোমাদের সাহায্য করব'। অগস্ত্য মুনি ও জটায়ু পক্ষীর পরামর্শে তাঁরা কুটির বেঁধে পঞ্চবটীতেই বাস করতে লাগলেন।"[৪১] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার /ছোটদের রামায়ণ]

৪। সূর্পণখার নাক-কান কেটে, রাক্ষসদের মেরেছে বলেই যে রাবণ সীতাকে হরণ করে তা হয়, সূর্পণখার কথায় সীতার প্রতি আসক্ত হয়েই রাবণ সীতা হরণ করতে যাই—

"রামের সঙ্গে তার প্রিয়া পত্নী সীতা আছে, সে বিশালাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রাননা, সুকেশী এবং তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তার নখ রক্তাভ ও উন্নত। দেবী গন্ধর্বী যক্ষা বা কিন্নরী— ভূতলে সীতার সমান কোনও নারী আমি দেখি না। সে যার ভার্যা হবে, যাকে আলিঙ্গন করবে, সে পুরন্দরের চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে। সীতা তোমারই যোগ্য, তাকে আমি আনতে চেষ্টা করেছিলাম তাই লক্ষ্মণ আমাকে বিরূপ ক'রে দিয়েছে। তাকে দেখলেই তুমি মন্মথশরে আহত হবে। যদি তাকে চাও তবে এখনই দক্ষিণ পদ অগ্রসর করে যাত্রা কর।"[৪২] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

একথা উপেন্দ্রকিশোর বলেননি। তিনি বলেছেন এইরকম ভাবে—

"তাহা শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, সম্মুখে সূর্পণখা, তাহার নাক কান কাটা। জনস্থানে রাক্ষসেরা মারা গেলে পর হতভাগী চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে লঙ্কায় চলিয়া আসিয়াছে। সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ আবার মারীচের কাছে ফিরিয়া গেল।"[৪৩] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৫। স্বর্ণমৃগের বর্ণনায় উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ শুধু 'সোনার হরিণ' কথাই বলেন, তার পরিপূর্ণ বর্ণনা দেননি। পরিপূর্ণ বর্ণনাটি এইরকম— "তার শৃঙ্গাগ্র উৎকৃষ্ট মণির তুল্য, মুখমন্ডল কোথাও শ্বেত কোথাও কৃষ্ণ, বদন রক্ত পদ্ম ও উৎপলের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল মণি ও নীলোৎপল তুল্য। তার গ্রীবা কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর ইন্দ্রনীলবর্ণ, পার্শ্ব মধুক পুষ্পের ন্যায় পদ্মরাগবর্ণ। খুর বৈদূর্যতুল্য, জঙ্ঘা ক্ষীণ ও দৃঢ়, পুচ্ছ ইন্দ্রধনুবর্ণ এবং উত্থিত। তার বর্ণ স্নিগ্ধ ও মনোহর, যেন নানাবিধ রত্নে ভূষিত। ক্ষণমধ্যে রাক্ষস মারীচ অতি শোভাময় মৃগের রূপ ধারণ করলে।"[৪৪][রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৬। রাবণ পরিব্রজকের বেশে এসে সীতার সঙ্গে কথোপকথনে, সীতার দেহের সৌন্দর্যের যে বর্ণনা করেন— "তোমার দশনরাজি সমান সুগঠিত চিক্কণ ও শুভ্র। নেত্র নির্মল ও আয়ত, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল, উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। তোমার ওই উচ্চ বর্তুল দৃঢ় ও লোভজনক স্তনযুগল উত্তম মণিময় আভরণে ভূষিত। তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য সুন্দর। অসিতনয়না, মাল্য গন্ধ বস্ত্র সবই তোমার অঙ্গস্পর্শে শ্লাঘ্য হয়েছে, তোমার পতিকেও ধন্য মনে করি। তুমি কে, কার নারী, কোথা থেকে এসেছ? কল্যাণী, তুমি কিজন্য এই রাক্ষসসেবিত ঘোর দন্ডকবনে একাকী রয়েছে?"[৪৫] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই এই সব কথা পরিহার করে গেছেন।

৭। সীতাকে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে এলে সীতার সঙ্গে রাবণের কথোপকথনের কথা অর্থাৎ সীতাকে প্রলোভিত করা বা সীতার প্রতি রাবণের আসক্তির কথা— "রাবণ তাঁকে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে লাগলেন। তাঁর প্রাসাদে সহস্র স্ত্রী এবং নানা মৃগ পক্ষী বাস করে। তার স্তম্ভসকল গজদন্ত স্বর্ণ স্ফটিক রৌপ্য হীরক ও বৈদূর্য নির্মিত, গবাক্ষ সুবর্ণের জালে আচ্ছাদিত।... রাজ্যভ্রষ্ট দীন পাদচারী অল্পায়ু রামকে নিয়ে তুমি কি করবে, আমিই তোমার যোগ্য ভর্তা। যৌবন অনিত্য, তুমি আমার সঙ্গে সুখভোগ কর, রামকে দেখবার আশা ছাড়, সে মনে মনেও এখানে আসতে পারবে না। তুমি এই বিশাল লঙ্কারাজ্য পালন কর, আমি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব। সমস্ত রাক্ষস ও দেবগণ তোমার সেবক হবে। তুমি পূর্বে যে পাপ করেছিলে তা বনবাসে ক্ষয় হয়ে গেছে, যা পুণ্য করেছিলে এখন তার ফল ভোগ কর।"[৪৬] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

—এই কথা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ কেউই উল্লেখ করেননি।

৮। জটায়ুর শেষকৃত্য সমাপনের পর রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে অন্বেষণের জন্য বন-জঙ্গলে ঘুরার সময় পথ মধ্যে বিরাট আকৃতির রাক্ষস-রাক্ষসী তাদের পথ আটকেছিল। রাক্ষসীর নাম আয়োমুখী ও রাক্ষস কবন্ধ। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ শুধু বিকৃত চেহারা সম্পন্ন রাক্ষস কবন্ধের কথাই বলেন রাক্ষসী আয়োমুখীর কথা বলেন নি। আয়োমুখীর কাহিনী এই রকম— "সেই ভীমাকৃতি লম্বোদরী তীক্ষ্ণদর্শনা মুক্তকেশী রাক্ষসী হরিণ খেতে খেতে লক্ষ্মণের কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললে, আমার নাম আয়োমুখী, তুমি আমার প্রিয় পতি, চল আমরা দুর্গম পর্বতে ও নদীপুলিনে গিয়ে বিহার করি। লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে খড়্‌গাঘাতে তার কর্ণ নাসিকা ও স্তন কেটে ফেললেন। আয়োমুখী বিকট চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল।"[৪৭] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত বা সংকুচিত কাহিনী

১। বালীর স্ত্রী তারা বালীকে রাম-লক্ষ্মণের কথা উল্লেখ করে যুদ্ধে না যাওয়ার কথা বলেন এবং সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তের কথা বলেন কিন্তু বালী স্ত্রী তারার কথা শোনেন নি-এই প্রসঙ্গ উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি।

২। অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় বালীকে শরাঘাত করার ফলে বালী গর্বিত ভাবে রামকে অধর্মের কথা বললে রাম তার উত্তরে বালীকে যে সমস্ত গর্হিত অপরাধের কথা বলেন—

"কেন তোমাকে বধ করছি তার কারণ শোন। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ ক'রে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করেছে। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূস্থানীয়া, কামবশে তুমি তাঁকে অধিকার করেছ। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত, ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছ, এজন্য এই বধদন্ড তোমার পক্ষে বিহিত।"[৪৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোর এইসব উল্লেখ করেন নি, তিনি বালীকে শুধু দুষ্ট লোক বলেই ছেড়ে দেন—

"রাম বলিলেন, তুমি দুষ্টু লোক, তোমাকে মারাতে আমার কোন অন্যায় হয় নাই।"[৪৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

অবশ্য যোগীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ খানিকটা বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন— "রামকে দেখে বালীর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে বলল, 'তোমাকে বীরের মধ্যে গনি না। তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ নয়; আমরা দু-ভাই যুদ্ধ করছি, তুমি লুকিয়ে চোরের মতো আমাকে বাণ মারলে, এ কেমন কথা!' রাম বালীকে বললেন, 'তুমি আমাকে অনেক বকলে ও লজ্জা দিলে। আর লজ্জা দিয়ো না, আমাকে ক্ষমা করো। অগ্নিসাক্ষী করে আমি সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। তুমি বড়োভাই হয়েও শক্তির অহংকারে তাকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়েছ, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার শত্রু হয়েছ। অতএব সুগ্রীবের শত্রুকে বধ না করে তার বন্ধুর কাজ কীরূপে করব?"[৫০] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৩। উপেন্দ্রকিশোর ময় দানবের মায়াবী পুরীর কথা বললেও ময় দানবের হেমা নামে এক অপ্সরার প্রতি আসক্তি ও তার ফলে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু এবং হেমার সখী স্বয়ম্প্রভার এই মায়াবী পুরু রক্ষার কাহিনী কিছুই উল্লেখ করেন নি।

কাহিনীটি এইরকম—

“তাপসী বললেন, ময় নামে এক মায়াবী দানব ছিলেন, তিনি দানবগণের বিশ্বকর্মা। ব্রহ্মার বরে মায়াবলে ময় এই হিরণ্ময় অরণ্য ও ভবনাদি নির্মাণ করেছেন। কিছুকাল এখানে বাস করার পর হেমা নামে এক অপ্সরার প্রতি তিনি আসক্ত হন, সে -কারণে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাতে বধ করেন। তখন ব্রহ্মা হেমাকে এই সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ম্প্রভা, হেমা আমার সখী। তাঁর অনুরোধে আমি এই বিশাল ভবন রক্ষা করছি।”[৫১] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য এই কাহিনীর পুরোটাই বাদ দিয়ে গেছেন।

৪। হনুমান পবন দেবের পুত্র এই কথা উপেন্দ্রকিশোর বলেন কিন্তু মাতা অঞ্জনার কথা কিছু বলেন নি। অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা অভিশাপের ফলে বানরেন্দ্র কুঞ্জরের দুহিতা হয়েছে এবং তিনি কেশরীর স্ত্রী। কিন্তু কী উপায়ে হনুমান পবনদেবের পুত্র হল অর্থাৎ হনুমানের জন্মবৃত্তান্তের কথা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ কেউই কিছু উল্লেখ করেন নি। বৃত্তান্তটি এই রকম—

“অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা তোমার মাতা, যাঁর অপর নাম অঞ্জনা। অভিশাপের ফলে তিনি বানরেন্দ্র কুঞ্জরের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেশরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একদা রূপযৌবনশালিনী কাম্যরূপিণী অঞ্জনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বায়ু তাঁকে আলিঙ্গন করেন। পতিব্রতা অঞ্জনা ভৎর্সনা করলে বায়ু বললেন, যশস্বিনী, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার অনিষ্ঠ করি নি, আমি মনে মনেই সংগত হয়েছি, তার ফলে তোমার একটি বীর্যবান বুদ্ধিমান মহাবলপরাক্রম আমারই সমান বেগবান পুত্র হবে। মহাবীর, অঞ্জনা তুষ্ট হয়ে গুহামধ্যে তোমাকে প্রসব করলেন। তুমি মহারণ্যে নবোদিত সূর্য দেখে ফল মনে ক'রে ধরবার জন্য আকাশে তিন শত যোজন উঠেছিলে, কিন্তু ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তেমার উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন। তখন তুমি শৈলশিখরে নিপতিত হও, তোমার বাম হনু ভগ্ন হয়ে যায়, সেই অবধি তোমার নাম হনুমান।”[৫২] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

<u>সুন্দরকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত বা সংকুচিত কাহিনী</u>

১। রাবণের ভবনের নানা স্থানের বিশেষত তার শয়ণ গৃহের যথার্থ বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর এবং দু-একটা কথায় যোগীন্দ্রনাথ করলেও ভবনের মধ্যে তার সহস্র বরনারীর কথা উল্লেখ করেন নি উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ। রাবণের স্ত্রীদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গেছেন তারা। রাবণের গৃহের বর্ণনা—

“হনুমান রাবণের শয়নগৃহে এলেন। জননী যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করেন, সেই গৃহ হনুমানকে সেইরূপে পরিতৃপ্ত করলে। তিনি ভাবলেন, একি স্বর্গ, না ইন্দ্রপুরী, না গান্ধর্বী মায়া? তখন অর্ধরাত্র, কাঞ্চনস্তম্ভের উপর প্রদীপ জ্বলছে, নানা বেশভূষাধারিণী সহস্র বরনারী পানমত্ত হয়ে বিচিত্র আস্তরণের উপর নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে, বোধ হচ্ছে যেন হংস-ভ্রমরের রবশূন্য পদ্মবন। হনুমান ভাবলেন, পূণ্যক্ষয় হ'লে যেসকল তারকা গগনচ্যুত হয় তারাই এখানে মিলিত হয়েছে। এইসকল নারীদের কেশপাশ মুক্ত, তিলক বিলুপ্ত, নূপুর হার মাল্য কাঞ্চী ও বসন স্খলিত। তারা বারণবোধে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে আছে।”[৫৩] [রাজাশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোরের ভাষায় রাবণের গৃহের বর্ণনা—

"লঙ্কার বাড়ি-ঘর যেমন বড় বড়, তেমনি সুন্দর। দরজা জানালা সোনার, রোয়াক পান্নার, সিঁড়িগুলি মানিকের।... রাবণের বাড়িতে সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়াছে। সেখানে কত আশ্চর্য জিনিসই হনুমানের চোখে পড়িল! সোনার জানালা, মানিকের সিঁড়ি, হাতির দাঁতের মূর্তি, স্ফটিকের থাম—সকলই আশ্চর্য। ইহার মধ্যে আবার সকলের চেয়ে আশ্চর্য রাবণের শুইবার স্থানটি; স্ফটিকের বেদী, তাহার উপরে নীলকান্ত মণির খাট, তাহাতে সোনালী কাজ-করা হাতির দাঁতের খুঁটি। কলের পুতুলসকল পাখা হাতে লইয়া সেই খাটে বাতাস করিতেছে।[৫৪] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

এইপ্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা—

"রাবণের অন্দরে ঢুকে হনুমান তো একেবারে অবাক! সোনার ঘর, রুপার সিঁড়ি, স্ফটিকের দরজা-জানলা—আরও কত অদ্ভুত জিনিস যে সে দেখল, তা আর কী বলব!"[৫৫] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। সীতাকে অন্বেষণ করতে গিয়ে রাবণের ভবনে উপস্থিত নারীদের শয়নকালীন অবস্থায় দেখার জন্য হনুমানের মনে যে ধর্মলোপের কথা উদয় হয়েছিল—

"হনুমান ভাবলেন, এইসকল নিদ্রিত পরস্ত্রীকে দেখার ফলে নিশ্চয় আমার ধর্মলোপ হবে। আমি এপর্যন্ত পরদার নিরীক্ষণ করি নি, অধিকন্তু এখানে পরদারপরায়ণ রাবণকেও দেখলাম। তিনি আবার ভাবলেন, রাবণের স্ত্রীরা বিশ্বস্তচিত্তে শুয়ে আছে, এদের দেখে আমার মনে তো কোনও বিকার হচ্ছে না। মনই ইন্দ্রিয়গণকে পাপপূণ্যে প্রবর্তিত করে।[৫৬] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোর তা উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অন্যরকম ভাবে—

"সেখানে অনেক মেয়ে রহিয়াছেন। কেহ দেবতার কন্যা, কেহ নাগের কন্যা; দেখিতে সকলেই সুন্দর। আবার বিকট চেহারা এবং ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মেয়েও অনেক আছে।"[৫৭] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি।

৩। সীতা অশোক বনে থাকার সময় গভীর রাতে রাবণ কামবিহ্বল হয়ে সীতার কাছে এসে কামনা ভিক্ষা করতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলে সীতাকে বশীভূত করতে চান, সে সমস্ত সব কথাই উপেন্দ্রকিশোর সুকৌশলে বাদ দিয়ে শুধু পাপবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য পাপবোধের কথাও উল্লেখ করেন নি। এই প্রসঙ্গ রামায়ণে এইরূপ—

"তাঁর কাছে গিয়ে রাবণ বললেন, সুন্দরী, আমাকে দেখে তুমি স্তন আর উদর গোপন ক'রে ভয়ে অদৃশ্য হ'তে চাচ্ছ। বিশালাক্ষী, তুমি সর্বাঙ্গ সুন্দরী সর্বলোকমনোহরা, তোমাকে আমি কামনা করছি, আমার মান রাখ ... দেবী, ভয় পেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে গ্রহণ ক'রে সর্বপ্রকার সুখলাভ কর, মহার্ঘ বসন ভূষণ শয্যা আসন, মদ্য নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি উপভোগ কর ...

তোমার এই চারু যৌবন উৎপন্ন হয়ে ক্রমেই অতিক্রান্ত হচ্ছে, নদীর স্রোতের ন্যায় চ'লে গেলে আর ফিরে আসবে না। হে শুভদর্শনা, আমার মনে হয় রূপকর্তা বিশ্বনির্মাতা তোমাকে সৃষ্টি ক'রেই নিবৃত্ত হয়েছেন, তাই তোমার রূপের আর

উপমা নেই। বৈদেহী, রূপযৌবন শালিনী তোমাকে পেয়ে কে স্থির থাকতে পারে? স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাও নয়।”[৫৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণে এইরূপ—

“তারপর যখন অনেক রাত্রি হইল, তখন রাবণ সেখানে আসিল। সে আসিয়া সীতাকে খুশি করিবার জন্য কতই মিষ্ট কথা কহিল, আবার কত লোভও দেখাইল। কিন্তু সীতা তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, ‘ওরে দুষ্ট, পাপ করাই বুঝি তোমার কাজ?”[৫৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

— রাবণের কামনা ভিক্ষার কথা, *মিষ্ট কথার* মধ্য দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার ভাবে এখানে তুলে ধরেছেন।

৪। কামবিহ্বল অবস্থায় সীতার কাছে তিরস্কৃত হওয়া ক্রুদ্ধ রাবণকে ধান্যমালিনী নামে এক রাক্ষসীর আলিঙ্গন এবং তার সঙ্গে কামসুখে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই পরিহার করেছেন।

৫। রাক্ষসী বুড়ী ত্রিজটার দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর তার রামায়ণে করেন নি শুধু স্বপ্নের মূল সার কথাটি তিনি তুলে ধরেছেন—

“এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বুড়ী রাক্ষসী সেখানে আসিয়া বলিল, ‘তোমরা সীতাকে কষ্ট দিও না। আজ আমি বড় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। বোধহয় রাবণ মরিয়া যাইবে আর লঙ্কাও ছারখার হইবে। তোমরা সীতাকে বকিয়াছ, এখন ইঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহ। তাহা হইলে হয়ত তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।”[৬০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য ত্রিজটার স্বপ্নের কোন কথা উল্লেখ করেন নি।

৬। হনুমান রাবণের ভালোর জন্য যে সমস্ত কথা বলে সীতাকে ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সে সমস্ত উপদেশের কথা তাদের রামায়ণে উল্লেখ করেন নি। উপেন্দ্রকিশোর শুধু বলেছেন এইভাবে—

“তোমার ধনজন এত আছে, তোমার কি এমন অন্যায় কাজ করা উচিত? তোমার ভালোর জন্যই বলিতেছি, আমার কথা শোন সীতাকে রাখিও না; তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে।”[৬১]

<u>লঙ্কাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে আংশিক বর্জিত বা সংকুচিত কাহিনী</u>

১। রাম, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রায় যে ভাবে সেনা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ যথার্থ ভাবে দেননি। অনেক কথায় পরিহার করে গেছেন। রামের সেনা নির্মাণের পদ্ধতিটি ছিল এই রকম—

“রাম বললেন, আজ উত্তরফাল্‌গুনী নক্ষত্র, কাল হস্তার সঙ্গে চন্দ্রের যোগ হবে। সুগ্রীব, এই শুভক্ষণেই আমরা সসৈন্যে যাত্রা করব। সেনাপতি নীল, তুমি পথ পরীক্ষার জন্য শতসহস্র দ্রুতগামী বানরসৈন্য নিয়ে আগে আগে যাও।... মহাবল গজ গবয় ও গবাক্ষ অগ্রভাগে যান, ঋষভ ও গন্ধমাদন দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। সৈন্যদলের মধ্যভাগে আমি হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে যাব। জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করুন।[৬২]

[রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

২। ছয় মাস নিদ্রিত অবস্থায় থেকে, নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণ সীতা হরণের সংবাদ শুনে রাবণকে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তা পরিহার করে গেছেন। কথাগুলি হল—

"কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি যখন একবার দেখেই মোহিত হয়ে সীতাকে রামের কাছ থেকে হরণ করেছ তখন আর বিচার ক'রে লাভ কি। মহারাজ, তুমি যা করেছ, তা তোমার অযোগ্য। যে রাজা মন্ত্রণদ্বারা কর্তব্য নির্ণয় ক'রে ন্যায়সংগত কার্য করেন তাঁকে অনুতাপ করতে হয় না। তুমি পরিণাম না ভেবে এই অন্যায় কার্য করেছ, বিষ মিশ্রিত মাংসের ন্যায় রাম যে এখনও তোমাকে বিনষ্ট করেন নি তা তোমার ভাগ্য।"[৬৩] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৩। রাম সদলবলে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে শুনে কুম্ভকর্ণ রামকে যে পরামর্শ দেন উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ কেউই তা উল্লেখ করেন নি। পরামর্শটি হল—

"মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ ক'রেও যে মধুপান করে না সে মূর্খ।... আপনি শত্রুর মাথায় পা দিয়ে বৈদেহীকে ভোগ করুন, কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন ক'রে সীতাকে বার বার সবলে আক্রমণ করুন। আপনার কামনা পূর্ণ হ'লে আর কিসের ভয়, যাই ঘটুক অনায়াসে তার প্রতিবিধান করতে পারবেন।"[৬৪] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৪। কুম্ভকর্ণের পরামর্শের উত্তরে রাবণ সীতাকে বলপূর্বক সংগম করতে না পারার যে কারণ উল্লেখ করেন তা যথার্থই উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে পারেন নি তাঁদের রামায়ণে—

"মহাপার্শ্বের প্রশংসা ক'রে রাবণ বললেন, একটি পূর্বকথা বলছি শোন। পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা আকাশমার্গে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল। আমি তাকে সবলে ধ'রে বিবসনা করি। তখন সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলে। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে তুমি যদি বলপূর্বক অন্য নারীর সংগম কর তবে তোমাকে মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। এই কারণে আমি সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে পারছি না।"[৬৫] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৫। বিভীষণের রামপক্ষ গমণের যে সমস্ত সুক্ষ্ম কারণ ছিল অর্থাৎ জ্ঞাতিবিরোধ জনিত কারণ তথা তাদের ভ্রাতৃবিরোধের কথা, তা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই তাড়িয়ে গেছেন। কারনগুলি হল—

"কিন্তু আমি জানি, প্রত্যক্ষ লৌকিক সূক্ষ্ম কারণে রাজাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হয়। জ্ঞাতি ও নিকটবর্তী দেশবাসী এই দুই দুই প্রকার শত্রু সংকট উপস্থিত হলেই হানির চেষ্টা ক'রে। বিভীষণের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিশত্রুতা নেই, তিনি লঙ্কারাজ্য লাভ করতে চান, এই কারণেই তিনি এখানে এসেছেন।"[৬৬] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

৬। লঙ্কায় প্রবেশের আগে পক্ষীরূপী শুক রাক্ষসের কথা এবং বানরদের তার উপর প্রহারের কথা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ না উল্লেখ করলেও লঙ্কায় প্রবেশের পর রামের সৈন্যদের গতিবিধি বোঝার জন্য শুক ও সারণের বানর রূপ ধরে বানর সৈন্যে প্রবেশের কথা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ যথার্থই তাদের রামায়ণে উল্লেখ করেছেন।

৭। বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গেলে ইন্দ্রজিৎ সেখানে লক্ষ্মণ সহ বিভীষণকে দেখলে যে সমস্ত

কঠোর বাক্যে বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেন— "ইন্দ্রজিৎ নিকটস্থ হয়ে বিভীষণকে দেখে কঠোর বাক্যে বললেন, তুমি এইখানেই জন্মগ্রহণ ক'রে বৃদ্ধ হয়েছ, তুমি আমার পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য হয়ে কি ক'রে আমার শত্রুতা করছ? দুর্বুদ্ধি, তুমি স্বজন ত্যাগ ক'রে পরের দাস হয়ে সাধুজনের নিন্দাভাজন হয়েছ। সে স্বপক্ষ ত্যাগ ক'রে পরপক্ষে যায়, স্বপক্ষ ক্ষীণ হ'লে পরপক্ষই তাকে বিনষ্ট ক'রে।"[৬৭] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

—এই অংশ উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ পরিহার করে গেছেন।

৮। রামের সীতা প্রত্যাখ্যানের অংশটি উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন। সীতা প্রত্যাখ্যানের আসল কারনটি এইরকম—

"তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম্—সুহৃদ্গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি—এ তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খন্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছ, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি— লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।"[৬৮] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

আর উপেন্দ্রকিশোর বলেছেন এইরকম ভাবে—

"সীতা আসিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন, 'সীতা, তুমি রাক্ষসদিগের সঙ্গে এতদিন ছিলে। এখন তুমি আমাদিগকে আগেকার মতন ভালবাস কি না তাহা কি করিয়া বলিব? আমি রাবণকে মারিয়া তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চলিয়া যাও।"[৬৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৯। হনুমান ভরতকে রামের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিলে ভরত প্রীত হয়ে হনুমানকে যে সমস্ত উপহার দেন তা রামায়ণে আছে এই রকম—

"তুমি যে প্রিয় সংবাদ এনেছ তার জন্য আমি তোমাকে এক লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি সৎকুলজাতা চন্দ্রাননা সালংকারা কন্যা দিচ্ছি।"[৭০] [রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

এবং উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণে আছে এই রকম— "আজ তুমি যে সংবাদ আমাকে শুনাইলে, তাহার পুরস্কার আমি তোমাকে কি দিব? তুমি এক লক্ষ গরু আর একশতখানি গ্রাম লও!"[৭১] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত/সংযোজিত কাহিনী

আদিকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত বা সংযোজিত কাহিনী

১। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মনদের থাকা-খাওয়া অর্থাৎ বাসস্থান নির্মাণ, অশ্বশালা নির্মাণ ইত্যাদির কথা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস বেশি করে বললেও উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু এই সব কথার চাইতে শিশুদের মন হরণকারী শব্দ 'নিমন্ত্রণ' খাওয়ার কথায় বেশি করে বলেন—

"যজ্ঞের কয়দিন সকলে কী আনন্দ করিয়া যে নিমন্ত্রণ খাইল, তাহা কী বলিব ! যত চাহিয়াছে ততই খাইতে পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক !' ছেলেদের পেট ভরিয়া গেল, তবুও তাহারা বলিল, 'আরও খাইব।'"[৭২] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

আর যোগীন্দ্রনাথ বলেন এইরকম ভাবে—

"অশ্বমেধ কাকে বলে, শোনো। একটি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়ার মাথায় জয়পত্র বেঁধে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘোড়ার পিছনে পিছনে অনেক সৈন্যসামন্ত থাকে। এই ঘোড়া বহুদেশ ভ্রমণ করে এক বছর পরে ফিরে এলে তাকে বলি দিয়ে হোম করা হয়। যদি কোনো দেশের রাজা সাহস করে এই ঘোড়াকে আটক করে, তবে পিছনের সৈন্যরা যুদ্ধ করে ঘোড়া ছাড়িয়ে নেয় এবং ওই রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। বড়ো বড়ো রাজা ছাড়া অন্য কেউ এই যজ্ঞ করতে পারতেন না।"[৭৩] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের ভিতর থেকে যে ব্যক্তি পায়েস নিয়ে আসেন তার বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই যথার্থভাবে করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনা—

"সেই যজ্ঞের আগুনের ভিতর হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাহার শরীর পাহাড়ের মত উঁচু, রঙ কালো, চোখ লাল, দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত, পরণে লাল কাপড়। তাঁহার হাতে রূপার ঢাকা দেওয়া সোনার থালা তাহাতে চমৎকার পায়স। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দশরথকে বলিলেন, 'মহারাজ ব্রহ্মা নিজে এই পায়স রাঁধিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা রানীদিগকে খাইতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হইবে।' এই বলিয়া তিনি কোথায় যে মিলাইয়া গেলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।"[৭৪] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা—

"তখন মহা আড়ম্বরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হল। সেই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে লাল কাপড়পরা এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উঠলেন। তাঁর হাতে উত্তম পায়সে পরিপূর্ণ একখানি সোনার থালা। তিনি দশরথের হাতে পায়েস সুদ্ধ থালা দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, ব্রহ্মা এই পায়েস পাঠালেন। এটি রানিদের খেতে দিন, তা হলেই আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' এই বলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উঠলেন। তাঁর হাতে উত্তম পায়সে পরিপূর্ণ একখানি সোনার থালা। তিনি দশরথের হাতে পায়েসসুদ্ধ থালা দিয়ে বললেন, 'মহারাজ ব্রহ্মা এই পায়েস পাঠালেন। এটি রানিদের খেতে দিন, তা হইলে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' এই বলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি দেখতে দেখতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"[৭৫] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৩। তাড়কা রাক্ষসীর সাথে যুদ্ধে জয়লাভের পর পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বামিত্র রামকে যে সমস্ত অস্ত্র দিয়েছেন, যোগীন্দ্রনাথ তাঁর রামায়ণে একটিরও নাম উল্লেখ করেন নি। তবে উপেন্দ্রকিশোর প্রায় সবগুলো অস্ত্রের নামই বলেছেন তাঁর রামায়ণে, যেখানে রাজশেখর বসুও সবগুলো অস্ত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। উপেন্দ্রকিশোর বলেছেন—

"ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, ব্রহ্মশির, ঐষিক, ব্রহ্মাস্ত্র ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক অশনি, আর্দ্র অশনি, পৈনাক, নারায়ণ, শিখর, বায়ব্য, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, কঙ্কাল, মুষল, কপাল, কিঙ্কিনী, নন্দন, মোহন, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মাদন, মানব, তামস, সৌমন, সংবর্ত—আর কত নাম কবির! এ-সকল ছাড়া, আরও অনেকগুলি অস্ত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা, শূল, বজ্র ইত্যাদি বিশ্বামিত্রের ডাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।"[৭৬] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী / ছেলেদের রামায়ণ] [আর কেন এই বিস্তৃতি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে]

রাজশেখর বসুর রামায়ণে আছে এইরকম—

"বিশ্বামিত্র পূর্বাস্য হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। তখন দন্ডচক্র, বিষ্ণু চক্র, বজ্র, শৈব শূল, বারুণ পাশ, বায়ব্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র প্রভৃতি নানা দিব্যাস্ত্র রামের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললে, রাঘব, আমরা তোমার কিংকর, তুমি যা ইচ্ছা করবে আমরা তাই করব।"[৭৭][রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

অযোধ্যাকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত বা সংযোজিত কাহিনী

১। মন্থরার উপদেশে কৈকেয়ী যে ছলনায় দশরথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে রামকে বনে পাঠায় ও ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এই সব কথা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তাদের রামায়ণে যথার্থভাবে বর্ণনা করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনা—

"শেষে রাজা বলিলেন, 'তোমার কি কিছু চাই? বল সেটা কোন্ জিনিস, এখনই তাহা দিতেছি।' তখন কৈকেয়ী বলিলেন, 'আগে প্রতিজ্ঞা কর দিবে, তবে বলিব।' রাজা বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে রামের মতন আমি কাহাকেও ভালবাসি না। সেই রামের নাম লইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাইবে তাহাই দিব।"

এ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, 'দেবতারা শুনুন, রাজা কী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।... নিষ্ঠুর কৈকেয়ী বুঝিয়াছিলেন যে রাজা একবার 'দিব' বলিলে আর প্রাণ গেলেও 'দিব না' বলিতে পারিবেন না। তাই এখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, 'রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসী সাজাইয়া দণ্ডক বনে পাঠাইতে হইবে, আর ভরতকে রাজা করিতে হইবে।"[৭৮] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী / ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা—

"রাজা বললেন, 'কৈকেয়ী, আজ শুভদিন; তোমাকে আনন্দের সংবাদ দিতে এলাম, কিন্তু তোমার এইরকম অবস্থা দেখে মনে বড়োই কষ্ট হচ্ছে। তুমি কী চাও, বলো, আমি তোমাকে তাই দেব।' এইবার কৈকেয়ীর মুখে কথা বের হল। তিনি দশরথকে পূর্বের বরদানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং রাজা আজ তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন, এই কথা পুনরায় রাজাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন। দশরথ যে পরম সত্যবাদী, এটা রানি জানতেন; সুতরাং এখন আর বর চাইতে তাঁর কোনো বাধা রইল

না। তিনি স্বচ্ছন্দে এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনগমনের অন্য বরে ভরতের রাজা হওয়ার প্রস্তাব করে বসলেন।”[৭৯] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। কৈকেয়ীকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গা করার জন্য দশরথ যেভাবে কৈকেয়ীর কাছে কাকুতি-মিনতি করেন সেই সমস্ত সব কথায় উপেন্দ্রকিশোর তুলে ধরেছেন—

“শেষে তিনি আবার বিনয় করিয়া বলিলেন, ‘কৈকেয়ী, আমি বুড়া হইয়াছি, আর বেশিদিন বাঁচিব না। আমাকে দয়া কর! আমার আর যাহা আছে সকলই দিতেছি; তোমার পায়ে পড়ি, রামকে ছাড়িবার কথা আমাকে বলিও না!’

দশরথ এইরূপে কত দুঃখ কত মিনতি করিলেন, কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর কিছুতেই দয়া হইল না।”[৮০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথও তুলে ধরেছেন দু’-একটা কথার মধ্য দিয়ে—

“দশরথ এই নিষ্ঠুর কথা শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মূর্ছা ভাঙল। তখন তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন; কিন্তু কৈকেয়ী তাঁর কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না। দশরথ আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।”[৮১] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার /ছোটদের রামায়ণ]

৩। সুস্থির চিত্তে রামের পিতৃসত্য পালনের কথা বা কর্তব্য পরায়ণ রামের নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য পালনের কথা অর্থাৎ পিতার মর্যাদা রক্ষার জন্য অবলীলায় নিঃসংকোচে রাজ্য, মা, ভাই সবকিছুকে ত্যাগ করে নিজের সমস্ত সুখভোগকে বিসর্জন দিয়ে বনবাসী হওয়ার ঘটনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তাঁদের রামায়ণে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের সাবলীল ভাব—

“ এ কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু রাম একটুও দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা মা, তাহাই করিব। এমন কী কাজ আছে, বাবা বলিলে যাহা না করিতে পারি? আজই ভরতকে আনিতে দূত পাঠাইয়া দিন। আমিও আজই বনে চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু বাবা কেন নিজে আমাকে এ কথা বলিলেন না?”[৮২] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাব—

“রাম বললেন, ‘পিতা, আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনার সত্যরক্ষার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারি রাজ্য তো কোর ছার! আর প্রাণের ভাই ভরত রাজা হবে, এতেই বা আমার কষ্টের কারণ কী? আপনি দুঃখ করবেন না, আমি এখনই বনে যাচ্ছি।’ এই বলে পিতার ও বিমাতা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করে রাম সেই গৃহ থেকে বের হলেন।”[৮৩] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

[কেন এই সমস্ত ঘটনাকে উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন তা আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে।]

৪। বনবাস যাত্রাকালে রাম বুড়ি ত্রিজটাকে যে পদ্ধতিতে সহস্র গরু দান করেন, তা যথার্থ রঙ্গা রসিকতায় পূর্ণ করেই উপস্থাপন করেন উপেন্দ্রকিশোর—

“সেই বুড়া বামুনের গায়ে কী জোরটাই ছিল! তখন তিনি কসিয়া কোমর বাঁধিয়া, ‘হেঁই—হো’ শব্দে লাঠিগাছটাকে একেবারে সরযূ পার করিয়া দিলেন, ততদূর অবধি গণিয়া দেখা গেল, এক লক্ষ গরু। রাম ইহাতে যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সেই লক্ষ গরু তো তাঁহাকে দিলেনই তাহা ছাড়া আরও অনেক ধন দিলেন।”[৮৪] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য এই ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেন নি।

৫। রামের বিরহে দশরথ ও কৌশল্যার শোকাতুর অবস্থার কথা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই তাদের রামায়ণে তুলে ধরেছেন।

৬। চিত্রকূট পর্বতে যখন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে ভরত-শত্রুঘ্নের দেখা হয় তখন তাদের বেদনামিশ্রিত মিলনের কথা উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার ভ্রাতৃসুলভ করে বর্ণনা করেছেন— “এদিকে ভরত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে রামের ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। লতাপাতার ঘরখানি, তাহার ভিতরে রামের ধনুক দেখা যাইতেছে। আরও কাছে আসিলে দেখিলেন, রাম ঘরের ভিতর চামড়ার আসনে বসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন; পরনে গাছের ছাল, মাথায় জটা। তাহা দেখিয়া ভরতের মনে কী কষ্টই হইল! তিনি ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু পৌঁছিবার আগেই পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া কেবল ‘দাদা’ এই কথাটি মাত্র বাহির হইয়াছিল, আর কথা সরিল না। ততক্ষণে শত্রুঘ্নও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রামের পায়ে পড়িলেন। তারপর চারি ভাই গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।”[৮৫] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

— এই বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথও কোন অংশে কম যায় না—

“অবশেষে তাঁরা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বনে গমন করলেন। চিত্রকূট পর্বতে চার ভাইয়ের মিলন হল। এত শোকের মধ্যেও সেই মিলন কী মধুর! ভরত রামের পায়ে ধরে কাঁদেন, রাম তাঁকে বুকে নিয়ে চোখের জলে ভাসেন। রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভরতের কী আগ্রহ— কী কাতর অনুনয়! কিন্তু রাম পিতার সত্য পালন করতে বনে এসেছেন, কীরূপে ফিরবেন? তিনি সেকথা ভরতকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বললেন।”[৮৬] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

[কেন এই বিস্তৃত ভ্রাতৃসুলভ বর্ণনা, তা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে]

৭। রামের প্রতি ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম যথার্থই তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ। রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলে তার পাদুকা নিয়ে রাজ্য পরিচালনার কথা উভয়েই যথার্থ ভাবেই বর্ণনা করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনা—

“তখন ভরত বলিলেন, ‘দাদা, যদি নিতান্তই না যাইবে, তবে তোমার পায়ের খড়ম দু-খানি আমাকে খুলিয়া দাও। এখন হইতে এই খড়মই আমাদের রাজা। আমরা ইহার চাকর। তোমার এই খড়ম লইয়া চৌদ্দ বৎসর তোমার মত গাছের ছাল পরিয়া, ফলমূল খাইয়া, অযোধ্যার বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তাহার পরের বৎসরের প্রথম দিনে যদি তুমি ফিরিয়া না আইস, তবে আগুনে পুড়িয়া মরিব!”[৮৭] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা—

"তখন ভরত বললেন, 'দাদা, যদি কোনোমতেই ফিরবে না, তবে তোমার খড়মজোড়া দাও। ওই খড়মই আমাদের রাজা হবে। আমি অযোধ্যায় যাব না; নন্দীগ্রামে রাজসিংহাসনে খড়ম রেখে তার নীচে বসে রাজকার্য চালাব। কিন্তু মনে রেখো, যেদিন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হবে, তার পরদিনই যদি তোমাকে দেখতে না পাই, তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা জুড়াব।"[৮৮] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

[কেন এই বিস্তৃত ভ্রাতৃসুলভ বর্ণনা, তা আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে]

অরণ্যকান্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত বা সংযোজিত কাহিনী

অরণ্যকাণ্ডে যে সমস্ত জায়গায় রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষসদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে সেই সমস্ত সব জায়গা গুলোকেই উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথ প্রসারিত বা অন্যান্য অংশের তুলনায় একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

১। অরণ্যকাণ্ডের সূচনাতেই বিরাধ রাক্ষসের সাথে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধের বর্ণনা।

২। ইল্বল-বাতাপির কথা অর্থাৎ ইল্বলের ভেড়া সেজে ব্রাহ্মনকে বধ করার কৌশল শিশুদের আকর্ষন অনুভব করবে বলে যথার্থ ভাবেই এই অংশের বর্ণনা করেছেন—

"ইল্বল আর বাতাপি দুই ভাই ছিল। ইহাদের কাজ ছিল কেবল ব্রাহ্মণ মারিয়া খাওয়া। ইল্বল ব্রাহ্মণ সাজিয়া, সংস্কৃত কথা আওড়াইতে আওড়াইতে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইত। কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেই বলিত, 'আমার বাড়িতে শ্রাদ্ধ, আপনার নিমন্ত্রণ।' শ্রাদ্ধের কথা একেবারেই মিথ্যা; আসলে ফাঁকি দিয়া ব্রাহ্মণ বেচারাকে নিজের বাড়িতে আনা চাই।...

দুরাত্মা, সেই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া আনিয়া ভেড়া খাইতে দিত। সে আবার যে-সে ভেড়াও নয়, তাহার ভাই বাতাপি সেই ভেড়া সাজিত। সেই ভেড়ার মাংস রাঁধিয়া যে ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত, আর খাওয়া হইলে ডাকিত, 'বাতাপি, বাতাপি!' বাতাপি তখন ভেড়ার মত 'ভ্যা ভ্যা' করিতে করিতে বেচারা ব্রাহ্মণের পেট চিরিয়া বাহির হইত। এইরূপে তাহারা অনেক ব্রাহ্মণ মারিয়াছিল।"[৮৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৩। দূষণ, ত্রিশিরা ও খর রাক্ষসের সাথে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধের কথাও বলিষ্ঠ ভাবেই উপস্থাপন করেছেন উপেন্দ্রকিশোর।

৪। জটায়ুর সঙ্গে রাবনের যুদ্ধে জটায়ু পাখির নখ ও চঞ্চু দিয়ে রাবণের মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার বর্ণনা, অন্যান্য যুদ্ধের অংশ থেকে এই অংশের বর্ণনাতে শিশুরা একাত্মতা অনুভব করবে বলে এই অংশের বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর সাবলীল ভাবেই করেছেন।

৫। মুনি ও ইন্দ্রের অভিশাপে মস্তক, গ্রীবাহীন, দীর্ঘ বাহুযুক্ত, উদরে মুখয়ালা রাক্ষস কবন্ধের সাথে রাম-লক্ষণের যুদ্ধের বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর যথার্থভাবেই করেছেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত বা সংযোজিত কাহিনী

১। সুগ্রীব সীতা অন্বেষণের জন্য বৃহৎ বানর সৈন্যদের দলে দলে বিভক্ত করে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী পাঠান এবং তা করতে গিয়ে সমগ্র পৃথিবীর এমনকী পাতাল পর্যন্ত যে চমৎকার বর্ণনা তিনি দেন তা উপেন্দ্রকিশোর তাঁর রামায়ণে যথার্থ বলিষ্ঠ ভাবেই তুলে ধরেছেন—

"সমুদ্রে যে-সকল দ্বীপ আর পাহাড় আছে, সেখানে ভয়ঙ্কর কালো কালো জন্তু থাকে, তাহাদের কান পর্দার মত হইয়া ঠোঁট অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একটা বৈ পা নাই কিন্তু তবুও তাহারা বাতাসের মত ছোটে—সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে পিঙ্গলবর্ণ কিরাতেরা থাকে—তাহারা কাঁচা মাছ খায়—সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

বাঘমুখো মানুষের দেশে, জব দ্বীপে, স্বর্ণ দ্বীপে, রৌপ্য দ্বীপে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

ভয়ঙ্কর ইক্ষু সমুদ্রের ধারে বিকটাকার রাক্ষসেরা থাকে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া টানিয়া টানিয়া তাহাকে খায়। সেইখানে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর লাল সমুদ্র। সেখানে রাক্ষসেরা পাহাড়ের চূড়া ধরিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতে থাকে। সূর্যের তেজে তাহাদের মাথা গরম হইয়া গেলে তাহারা সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়; সেখান হইতে ঠান্ডা হইয়া আবার পাহাড়ে উঠিয়া ঝুলিতে থাকে। সেই লাল সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তারপর ক্ষীরোদ সমুদ্র। তারপর জলোদ সমুদ্র। সেখানে অতি বিশাল একটা ঘোড়ার মুখ হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সমুদ্রের জন্তুসকল ভয়ে চিৎকার করিতেছে। সেই জলোদ সমুদ্রে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

যেখানে সূর্য উদয় হয়, সেই সোনার পর্বতে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল। তাহার পরে কেবলই অন্ধকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

বৃষভ পর্বত দেখিতে ষাঁড়ের মতন, তাহাতে গন্ধর্বেরা থাকে। সেখানে নানারকম চন্দন গাছ আছে; কিন্তু তাহার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই বিপদ হয়। সেখানেও তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

চন্দনগিরি নামক পর্বতে একরকম পক্ষী থাকে, তাহার নাম সিংহ পক্ষী। তাহার হাতি আর তিমিমাছ ধরিয়া খায়। সেই পক্ষীর বাসায় তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

সুমেরু পর্বত পার হইলে অস্তাচল; সেখানে সূর্য অস্ত যান। ততদূর পর্যন্ত তাহারা সীতাকে খুঁজিতে গিয়াছিল। তাহার পর কেবল অন্ধকার; সেখানে কেহই যাইতে পারে না।

উত্তরকুরু দেশের নদীতে সোনার পদ্ম ফোটে, আর তাহার তীরে মুক্তা ছড়ানো থাকে। সেই দেশে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল।

তাহার পরে উত্তর সমুদ্র। তাহার মাঝখানে সোমগিরি নামক সোনার পর্বত আছে। সূর্য না উঠিলেও, সোমগিরির আলোকেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সোমগিরি বড় ভয়ানক পর্বত; সেখানে বানরেরা যাইতে পারে নাই। এইরূপ

করিয়া তাহারা সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইল।"[৯০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথও এই কাহিনী তুলে ধরেছেন তবে দু'একটা কথার মধ্য দিয়ে— "তারপর বড়ো বড়ো সাহসী বানর পাঠিয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম-চার দিকে সীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।... বানরেরা মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড়, পাহাড়-পর্বত, এমনকী আকাশ-পাতাল সমস্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেও সীতার সন্ধান পেল না।"[৯১] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

[কেন এই দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ে।]

সুন্দরকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত ও বা সংযোজিত কাহিনী

১। মহেন্দ্র পর্বত থেকে লাফ দিয়ে হনুমানের সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনাটিকে উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার বলিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন—

"সেই লাফের চোটে পর্বতের গাছপালা অবধি তাহার পিছু-পিছু ছুটিয়া চলিল; সমুদ্রের জল গিয়া আকাশে উঠিল। তখন হনুমানকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন একটা পর্বত আকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিতেছে।"[৯২] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

এমনকী সমুদ্র যাত্রা পথে বিভিন্ন রাক্ষসীদের সাথে যুদ্ধে, হনুমানের ক্ষুদ্র ও বিরাট আকার ধারণের ঘটনাটিকে যথার্থ ভাবেই তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনা এইরকম—

"পর্বত থেকে লাফ দেবার পূর্বে হনুমান তার দেহ ফুলিয়ে এমন ভয়ংকর করে তুলল যে, কার সাধ্য সেদিকে চায়। দেবতারা পর্যন্ত অবাক হলেন। তখন তামাশা দেখবার জন্য তাঁরা 'সুরসা' নামে এক নাগিনীকে পাঠিয়ে দিলেন। সে সমুদ্রের উপর আকাশ-পাতালজোড়া প্রকাণ্ড হাঁ করে সকল পথ বন্ধ করল। কিন্তু হনুমানের কাছে তার কৌশল খাটল না। এরপর 'সিংহিকা' নামে একটা রাক্ষসীও ঠিক সেইরকম হাঁ করে দাঁড়াল। কিন্তু সে হনুমানকে আটকাতে পারল না। হনুমান রাক্ষসীর পেটের ভেতর ঢুকে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের হয়ে গেল। "[৯৩] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। লঙ্কাপুরী সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল বসত লঙ্কাপুরীর সমস্ত বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর যথেষ্ট সাবলীল ভাবেই করেছেন—

"সেখানে কত আশ্চর্য জিনিসই হনুমানের চোখে পড়িল! সোনার জানালা, মানিকের সিঁড়ি, হাতির দাঁতের মূর্তি, স্ফটিকের থাম—সকলই আশ্চর্য... সোনার থালা ঘটিতে, মণির কাজ করা স্ফটিকের বাটিতে কতরকম খাবার জিনিস রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"[৯৪] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যোগীন্দ্রনাথ করেছেন এইভাবে—

"রাবণের অন্দরে ঢুকে হনুমান তো একেবারে অবাক! সোনার ঘর, রূপার সিঁড়ি, স্ফটিকের দরজা-জানালা—আরও কত অদ্ভুত জিনিস সে যে দেখল, তা আর কী বলব!"[৯৫] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

৩। অশোক বনে সীতার চারপাশে যে সমস্ত রাক্ষসীরা সীতাকে পাহারা দিত তাদের চেহারায় বর্ণনা যোগীন্দ্রনাথ দু-একটা কথায় করলেও উপেন্দ্রকিশোর তাদের বর্ণনা চমৎকারভাবে কৌতুকবোধে করেছেন—

"এদিকে সীতা বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোনটা লম্বা, কোনটা কুঁজো, কোনটা কানা। কোনটার কান হাতির কানের মত চ্যাটালো; কাহারও কান আবার ঘোড়ার কানের মত সুচালো। কোনটার গলা হাড়গিলার গলার মতন লম্বা। কোনটার গায় এত লোম যে দেখিলে মনে হয় যেন কম্বল পরিয়াছে... কোনটার মুখ শেয়ালের মুখের মতন। কোনটার হাতির পায়ের মতন পা। এক-একটার আবার হাতির শুঁড়ের মত শুঁড়ও আছে। কোনটার জিহ্বা লক-লক করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।"[৯৬] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৪। হনুমানের লঙ্কা উপদ্রপের বর্ণনা ও বিভিন্ন রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ যথার্থই করেছেন।

৫। রাবণের পুত্র অক্ষ ও ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধের কথাও উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ তাদের রামায়ণে যথেষ্টই করেছেন।

৬। হনুমানের লেজে আগুন দেওয়ার ঘটনাটিকে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ কৌতুকবোধে পূর্ণ করে উপস্থাপন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের বর্ণনা এইরকম—

"তখন রাক্ষসেরা বোঝা বোঝা নেকড়া আনিয়া হনুমানের লেজে জড়াইতে লাগিল। যত জড়ায় হনুমানের লেজ ততই বড় হয়, আর বেশি নেকড়া লাগে। লঙ্কার নেকড়া ফুরাইয়া যাইবার গতিক আর কি! নেকড়া জড়ান হইলে, তাহাতে তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।"[৯৭] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যেখানে রাজশেখর বসুর সারানুবাদে আছে এইরকম—

"রাবণের আদেশ শুনে রাক্ষসরা হনুমানের লাঙ্গুলে জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র জড়িয়ে তৈলাক্ত ক'রে তাতে অগ্নি দিলে। হনুমান তাঁর দেহ বর্ধিত ক'রে জলন্ত লাঙ্গুল দিয়ে রাক্ষসদের তাড়না করতে লাগলেন।"[৯৮][রাজশেখর বসু (সারানুবাদিত) / বাল্মীকি রামায়ণ]

লঙ্কাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে প্রসারিত বা সংযোজিত কাহিনী

১। শুক-সারন, রামের সৈন্যের যে বর্ণনা রাবণকে বলেছেন, তার বিশাল পরিমান বোঝানোর জন্য উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার ভাবে তা উপস্থাপন করেছেন। যা রামায়ণের অংশ থেকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ—

"মহারাজ, এক শত লক্ষে এক কোটি হয়। লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কুতে এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কুতে এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দে এক পদ্ম, লক্ষ পদ্মে এক মহাপদ্ম, লক্ষ পহাপদ্মে এক খর্ব, লক্ষ খর্বে এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্রে এক মহৌঘ। রামের সঙ্গে এইরূপ হিসাবে (১০০০০০, ১০০০০, ১০০০, ১০০০০০, ১০০০, ১০০০০০, ১০০০, ১০০০০০, ১০০০, ১০০০০০০০০০০) এক হাজার কোটি, একশত শঙ্কু, একহাজার মহাশঙ্কু, একশত বৃন্দ, একহাজার মহাবৃন্দ, একশত পদ্ম, একহাজার মহাপদ্ম, একশত খর্ব, একশত সমুদ্র আর একহাজার মহৌঘ সৈন্য আসিয়াছে।"[৯৯] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৩। রাম অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠালে অঙ্গদ নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর পিতা বালীর প্রসঙ্গ তোলেন। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এই অংশে শুধু বালীর প্রসঙ্গ তুলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি বালীর কাছে রাবণের নাকাল হওয়ার বৃত্তান্তও বলেন

চমৎকারভাবে—

“এখানে একটা হাসির কথা বলি। অঙ্গদ যে রাবণকে তাহার পিতার নাম বলিয়া ‘তাহার কথা বোধহয় তোমার এখনও মনে আছে’ বলিল, তাহার কারণ কি জান? রাবণ একবার বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বড়ই নাকাল হইয়াছিল। রাবণ সকলকে যুদ্ধে হারাইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইত আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। যুদ্ধ করিবার আর লোক না পাইয়া শেষে সে একদিন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। বালী তখন সমুদ্রের ধারে চোখ বুজিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ মনে করিল, ‘এই বেলা উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জব্দ করি; চোখ বুজিয়া আছে, দেখিতে পাইবে না।’ এই বলিয়া ত সে পিছন দিক হইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে নাড়িতে পারিল না। ততক্ষণে বালি সন্ধ্যা সরিয়া, রাবণ মহাশয়কে পাখিটির মত খপ্ করিয়া বগলে পুরিয়া বসিয়াছে। বালী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি সমুদ্রের ধারে বসিয়া চারিবার সন্ধ্যা করিত। সবে তখন তাহার একবার সন্ধ্যা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং সে রাবণকে বগলে করিয়াই আরও তিনবার সন্ধ্যা করিল। এদিকে সেই বগলের চাপে, গরমে, ঘামে আর গন্ধে বেচারা চ্যাপ্টা হইয়া, সিদ্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া, পেট ঢাক হইয়া নাকালের একশেষ! মরে নাই কেবল ব্রহ্মার বরে। তাই অঙ্গদ এখন বলিল, ‘বোধহয় মনে আছে।’”[১০০] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৪। রাবণ যখন নিজে যুদ্ধ করতে আসেন তখন রাবণ ও তার সৈন্য-সামন্তের কথা উপেন্দ্রকিশোর চমৎকারভাবে বলেন—

“বিভীষণ বলিল, ‘ঐ যাহার রথের নিশানে সিংহের চেহারা দেখিতেছেন, সে ইন্দ্রজিৎ। আর ঐ যাহার খুব লম্বা চওড়া শরীর, তাহার নাম অতিকায়; সেও রাবণের পুত্র। ঐ যে হাতির গলায় ঘন্টার শব্দ হইতেছে, তাহার উপরে মহোদর। ঐ যে লাল রঙের যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়িয়া আছে, তাহার নাম পিশাচ। শূল হাতে ষাঁড়ের উপর চড়িয়া যে আসিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা। যাহার নিশানে সাপের ছবি, সে কুম্ভ। আর যাহার হাতে পরিঘ রহিয়াছে, সে নিকুম্ভ। ঐ যাঁহার মাথায় মুকুট আর উপরে সাদা ছাতা; তিনি নিজে রাবণ।’”[১০১] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

৫। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গ আসাতে উপেন্দ্রকিশোর কুম্ভকর্ণের বাল্য পরিচয় দিয়ে তাদের বর পাওয়ার যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা লঙ্কাকান্ডে অতিরিক্ত সংযোজন বলেই মনে হয়—

“কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। রাবণেরা তিন ভাই ছিল; রাবণ বড়, তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপর বিভীষণ। ইহারা বিশ্রবা মুনির পুত্র; ইহাদের মাতার নাম কৈকসী। বিশ্রবার আর এক পুত্রের নাম কুবের। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ জন্মিবার পূর্বেই বিশ্রবা কৈকসীকে বলিয়াছেন, ‘এ দুটো ভয়ঙ্কর রাক্ষস হইবে।’ কিন্তু বিভীষণের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, ‘এটি ধার্মিক হইবে।’ আসলেও তাহারা তেমনি হইল। রাবণের আর কুম্ভকর্ণের জ্বালায় লোক স্থির থাকিতে পারিত না। রাবণের চেয়ে কুম্ভকর্ণটা বেশি দুষ্ট ছিল। মুনিদিগকে পাইলেই সে দুষ্ট ধরিয়া খাইত....

এমন সময় দেবতারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, ‘দোহাই ঠাকুর, এই হতভাগাকে বর দিবেন না! ইহার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি। ... এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘মা তুমি গিয়া উহার বুদ্ধি নাশ করিয়া দাও।’

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কুম্ভকর্ণ, কি বর চাহ?’

কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি দিনরাত খালি ঘুমাইতে চাহি।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাহাই হউক।'

কুম্ভকর্ণের কথা অগস্ত্য মুনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথা বিভীষণ যাহা বলিয়াছে তাহা অন্যরূপ। বিভীষণ বলে যে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন, 'তুই ছয় মাস ঘুমাইবি আর একদিন জাগিয়া থাকিবি।'

"যাহা হউক, সে-অবধি কুম্ভকর্ণ কেবলই ঘুমায়। সেই কম্ভকর্ণকে এখন রাক্ষসেরা জাগাইতে চলিল।"[১০২] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

যেখানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদে আছে এই রকম—

"মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া এখনই জাগরিত কর। তাঁহার গাম্ভীর্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক, তিনি ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অবছন্ন আছেন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর।"[১০৩][হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অনুবাদিত) /বাল্মীকি রামায়ণ]

৬। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা এবং কুম্ভকর্ণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের বর্ণনা এককথায় কুম্ভকর্ণ সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর বর্ণনাই উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে করেন।

৭। রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের প্রায় সমস্ত ঘটনায় উপেন্দ্রকিশোর তাঁর রামায়ণে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিছুই প্রায় বাদ দেন নি। যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য খানিকটা সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৮। বিভীষণ, ভ্রাতা রাবণের প্রতি বিরূপ হলেও রাবণের মৃত্যুর পর তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পরেছিলেন আর তাঁর এই শোকাতুর অবস্থার কথা উপেন্দ্রকিশোর যথার্থই ভ্রাতৃসুলভ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর রামায়ণে—

"অবশ্য রাক্ষসেরা রাবণের জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছিল। যে বিভীষণ তাহার নিকট অপমান পাইয়া এত রাগের ভরে চলিয়া আসিয়াছিল, সে বিভীষণও কি কাঁদে নাই? বিভীষণই সকলের আগে কাঁদিয়াছিল। হাজার হউক, ভাই ত! রাগ যতই থাকুক, রাবণের মৃত্যুতে তাহা ভুলিয়া গিয়া সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। রাম তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।"[১০৪] [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী /ছেলেদের রামায়ণ]

উপেন্দ্রকিশোর লঙ্কাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ রাম-সীতার মিলনের মধ্য দিয়েই তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ' রচনা সমাপ্ত করেন। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সমাপ্ত করেন উত্তরাকাণ্ডে। অর্থাৎ এই উত্তরাকাণ্ডের বর্ণনা হবে শুধুমাত্র যোগীন্দ্রনাথের 'ছোটদের রামায়ণ' এর উত্তরাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে।

. 'ছোটদের রামায়ণ' এর উত্তরাকাণ্ডে রামায়ণ আখ্যান থেকে বর্ণিত কাহিনী

১। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরাকাণ্ডটি শুরু করেছেন এইভাবে—

"রামের মতো রাজা আর সীতার মতো রানি পেয়ে অযোধ্যাবাসিগণ যে কত সুখী হল, তা বলে শেষ করা যায় না।

এতে রাজা-রানিরই বা আনন্দ কত! কিন্তু হায়! চিরদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে এ সুখ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। রাজা হবার কিছুকাল পরে, রাম হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন যে, তিনি পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করেছেন বলে প্রজাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি তাঁর বিচার-বিবেচনার দোষ দিয়ে থাকে। সীতার সম্বন্ধে লোকের এইরূপ সন্দেহ রামের বক্ষে বজ্রের ন্যায় আঘাত করল। দারুণ শোকে ক্রমে তিনি বড়োই বিচলিত হলেন এবং প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বনে রেখে আসতে লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করলেন। হায়, অভাগিনী সীতা! না জানি বিধাতা তোমার কপালে আরও কত দুঃখ লিখেছেন।"[১০৫] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

২। তারপর সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকি মুনির লালন-পালন ও বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজ পুত্র কুশ ও লবের জন্মের কথা ও বাল্মীকি মুনির দ্বারা শাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা ও রামায়ণগান শেখার কথা, এইসব যোগীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন।

৩। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঋষি মুনিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকিরও কুশ-লবকে নিয়ে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে গমন ও কুশ-লবের অযোধ্যাবাসীর সঙ্গে রামের মন জয় করার কথা এবং সেই সঙ্গে সীতা প্রসঙ্গ আসার কথাও যোগীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

৪। বাল্মীকির নিবেদনে পুনরায় সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এসেও প্রজারঞ্জনের জন্য রামের নিশ্চুপ থাকায় সীতার বসুমতীর কোলে ফিরে যাওয়ার কাহিনীও যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন তার রামায়ণে।

৫। রামের লক্ষ্মণ বিসর্জনের কাহিনীও যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন চমৎকার ভাবে—

"এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। অবশেষে একদিন স্বয়ং কালপুরুষ এসে রামের সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে গোপনে আমার কিছু কথা আছে। যদি প্রতিজ্ঞা করেন— আমাদের কথাবার্তার সময় যে কেউ আপনার কাছে আসবে, তাকেই আপনি ত্যাগ করবেন, তবেই আমি সেকথা বলতে পারি।' ...

এমন সময় হঠাৎ দুর্বাসা এসে উপস্থিত। ... তিনি এসেই রামের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ বিনয় করে বললেন, 'আপনি অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন; তিনি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন।' একথায় দুর্বাসা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন; বললেন, 'যদি এখনই আমাকে রামের কাছে নিয়ে না যাও, তবে শাপ দিয়ে সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে ভস্ম করে ফেলব।' লক্ষ্মণ বিশেষ ভয় পেলেন। নিজেকে রক্ষা করতে গেলে বহু নিরীহ লোক মারা যায়, কাজে কাজেই তিনি আর দেরি না করে দুর্বাসার সংবাদ নিয়ে রামের সঙ্গে দেখা করলেন।

লক্ষ্মণকে দেখেই কালপুরুষ বিদায় নিলেন। ... দুর্বাসা চলে গেলে, লক্ষ্মণের কথা ভেবে রাম বজ্রাহতের মতো হয়ে পড়লেন। তাঁর ভাবগতিক দেখে লক্ষ্মণের ভয় হল। তিনি ছুটে এসে রামের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'দাদা, এসময় ব্যাকুল হলে চলবে কেন? পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে থেকে তুমি আমাদের সত্যের মর্যাদা শিখিয়েছ, আজ আমাকে ত্যাগ করে সত্যের গৌরব রক্ষা করো'। ... রামের পদধূলি মাথায় নিয়ে তিনি রাজপুরী ছেড়ে চলে গেলেন এবং সরযূর পবিত্র জলে নেমে ধ্যানস্থ হয়ে দেহ বিসর্জন করলেন।"[১০৬] [যোগীন্দ্রনাথ সরকার /ছোটদের রামায়ণ]

৬। এরপর লক্ষ্মণের বিরহে রামের বিবশাবস্থার কথা উল্লেখ করে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর রামায়ণ কাহিনী শেষ করেন এই ভাবে—

"এরপর রাম আর বেশিদিন রাজত্ব করেননি। একে একে সকলেই চলে গেলেন, কীসের মায়ায় তিনি আর বেঁচে

থাকবেন? ক্রমে তাঁর দেহবন্ধন শিথিল হয়ে এল।

‘কিছুদিন মাত্র যাপি এইভবে রাম।

অনন্ত শান্তির কোলে লভিলা বিরাম।।

যদিও আপনি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত।

রহিল অনন্ত কীর্তি চির-জাগরিত।।” [১০৭][যোগীন্দ্রনাথ সরকার/ছোটদের রামায়ণ]

‘ছোট্ট রামায়ণ’ এর আদিকান্ড

উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছোট্ট রামায়ণ’ আবার আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে আমাদের কাছে সূচনায় তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গীতে। পদ্যের আকারে লেখা এই রামায়ণে তিনি ছোট ছোট পরিচিত শব্দগুলোকেই এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এটা বারবার পড়তে থাকি অথচ মনের আশ যেন মেটেই না। যুক্তাক্ষর বর্জিত পাঁচালীর ঢঙে লেখা ‘ছোট্ট রামায়ণ’ র প্রথমকান্ড অর্থাৎ আদিকান্ডের সূচনায় পংক্তিগুলি এই রকম—

“সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,

দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।

সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,

ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।

বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,

দুঃখী জনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।”[১০৮]

অযোধ্যা নগরের সোনা, মণি, মুক্তার মতন সূচনার পংক্তি কয়টির শব্দগুলোও যেন আমাদের কাছে সোনা, মণি মুক্তার মতনই ঝলমল করে শ্রুতি সৌন্দর্য মধুর হয়ে।

অযোধ্যা নগরের পর দশরথের তিন রানীর বর্ণনা করেন উপেন্দ্রকিশোর এবং নামতা পড়ার ঢঙে দু-একটা শব্দের মধ্য দিয়েই যেন তাদের সম্বন্ধে ধারণা জন্মে দেন আমাদের মনে —

“রানী তাঁর তিনজন, পরীর মতন,

দেবতা সেবায় সদা কৌশল্যার মন।

কৈকেয়ী রূপসী বড়, থাকেন আদরে,

সুমিত্রা সরলা তাঁর মুখে মধু ঝরে।”[১০৯]

পাঁচালী সুরেই আবার তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বর্ণনা করেন দুটি চরণের মধ্য দিয়ে এই রকম ভাবে—

“আসিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিমহাশয়,

শিঙ নেড়ে কথা কন, দেখে লাগে ভয়।

ভারি যজ্ঞ করিলেন সেই মুনিবর,

'পুত্রেষ্টি' তাহার নাম, দেখিতে সুন্দর।"[১১০]

এর পরের কাহিনীও বর্ণনা করেন একই রকম ভাবেই—

"সে আগুন হতে তায়, পায়স লইয়া,

লালবেশে দেবদূত আসিল উঠিয়া।

কালো মুখে হাসি, তাহে ঘোর দাড়ি জট,

লাল চোখ পাকাইয়া তাকায় বিকট।

রাজারে পায়স দিয়া কহিল সেজন,

"রানীদের দাও গিয়া করিতে সেবন।"[১১১]

রানীদের পায়েস খাওয়া পর্যন্ত আমরা দেখি যে উপেন্দ্রকিশোর পাঁচালীর সুরে বর্ণনা করেন। তারপর দশরথের চার ছেলে হওয়ার কথা ও ছেলে হওয়ার ফলে আনন্দ উৎসবের কথা একাবলীর ধাচে বর্ণনা করেন অর্থাৎ লয় এখানে দ্রুত—

"তাহার পরে বছর গেলে,

রাজার হল চারিটি ছেলে।

আদরে তুলে নিলেন বুকে,

সুখের হাসি ফুটিল মুখে।

বাজনা বাজে মধুর স্বরে,

শঙ্খ বাজে ঠাকুরঘরে।

কাঙাল হাসে কতই পেয়ে,

নড়িতে নারে মিঠাই খেয়ে।"[১১২]

রাজার চারপুত্রের নামকরন থেকে তাদের বড় হয়ে ওঠার নানা ঘটনা অর্থাৎ তাদের লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন তিনি দীর্ঘ ত্রিপদীতে ধীরে ধীরে —

"মুনি রাখিলেন নাম, বড় ছেলে হল রাম,

মাতা হন কৌশল্যা যাহার,

....

তীর খেলা কত মতো, শিখিল তা, কব কত?

মহাবীর হল চারি ভাই।"[১১৩]

তারপর বিশ্বামিত্র মুনির অযোধ্যায় এসে রাম-লক্ষ্মণকে তারকা রাক্ষসী বধের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব, দশরথের অনিচ্ছা ও শেষে সভাজনদের কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে পাঠানো ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনা করেন একটু দ্রুত গতিতে লঘু ত্রিপদীতে অর্থাৎ এই রকম ভাবে —

"একদিন রাজা আছেন বসিয়া

সিংহাসনে আপনার,

বিশ্বামিত্র মুনি এমন সময়ে

এলেন সভায় তাঁর।

... ...

দিন কয় তরে দেহ গো রামেরে,

রাক্ষস দিবে সে কাটি।"[১১৪]

এবং আমরা দেখি যে দশরথের দুই ছেলে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের তারকা রাক্ষসী বধের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় থেকে উপেন্দ্রকিশোর আবার পাঁচালীর সুরে ফিরে আসেন —

"মহা খুশি হয়ে যান মুনি তায়

দুইটি ভাইকে নিয়া।

রণবেশে দুই ভাই সাজি তারপর,

মুনির সহিত যান লয়ে ধনু-শর।

গুরুজন খান চুমো তাঁদের মাথায়

দেবতার নাম লয়ে করেন বিদায়।"[১১৫]

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমে তিনি অযোধ্যা নগর ও রাজা দশরথের কথা, ঋষ্যশৃঙ্গের কথা, যজ্ঞ ও যজ্ঞের মধ্য থেকে রাক্ষসের মতন দেবদূতের পায়েস নিয়ে আসা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করেন পাঁচালীর মেঠো সুরে অপরূপ ছন্দের দোলার মধ্য দিয়ে যাতে শিশুদের পড়ার প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়ে যায়। তারপর আবার দশরথের চার ছেলের জন্ম ও তাদের বড় হয়ে ওঠা , ও পড়াশুনা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদির কথা বিশ্বামিত্রের আগমন ও রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে তারকা রাক্ষসী বধের উদ্দেশ্যে যাত্রা অর্থাৎ একটা সাধারণ জীবনের কথা বর্ণনা করেন কখন দীর্ঘ ত্রিপদী, কখন লঘু ত্রিপদী আবার কখনও একাবলীর ধাচে। কিন্তু আবার যখন তারকা রাক্ষসী বধের প্রসঙ্গ আসে তখন শিশুদের কল্পনাকে আরও ভালোভাবে উদ্বেগ করার জন্য তিনি তাড়কা বধের বৃত্তান্ত ও তাঁর পুত্র মারীচ ও সুবাহুর সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধের বর্ণনা করেন পাঁচালীর ঢঙে অর্থাৎ গতি সেখানে দ্রুত। মনে হয়

যেন ছন্দের সঙ্গে খেলা করছেন তিনি। শুধু তায় নয়, তাড়কা রাক্ষসী এবং মারীচ ও সুবাহুর দীর্ঘ বর্ণনাও করেন তিনি।

তাড়কা রাক্ষসীর দীর্ঘ বর্ণনা —

"রামেরে বলেন মুনি, "হেথায়, রে ধন,
তাড়কা রাক্ষসী থাকে বিকট বদন।
....
এই পথে যেই যায়, তারে খায় গিলে,
আপদে মারহ বাপ দুই ভাই মিলে।"
....
টং-টং রবে তার রুষি ভয়ংকর,
দাঁত কড়্মড়ি বুড়ি কাঁপে থর্-থর্।
"হাঁই-মাঁই-কাঁই" করি ধাঁই ধাঁই ধায়,
হুড়মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।"[১১৬]

মারীচ-সুবাহুর দীর্ঘ বর্ণনা —

"যজ্ঞের আগুন যেই জ্বলিল তখন,
মেঘের উপর হল ভীষণ গর্জন।
তাহা শুনি দুই ভাই দেখেন চাহিয়া,
রাক্ষস খিঁচায় দাঁত অকাশ ছাইয়া।
জালাপানা মুখ আর ঝাঁটাপানা চুল,
কানে আঙুটির গোছা, হাতে শেল শূল।
... ...
মানব নামেতে বাণ জুড়িয়া ধনুকে,
ছুঁড়িয়া মারেন রাম মারীচের বুকে।
সেই বাণ খেয়ে বেটা, ঘোরে বন্-বন্
সাগরে পড়িল গিয়া হয়ে অচেতন।
অগ্নিবাণ খেয়ে গেল সুবাহু মারিয়া,

বায়ুবাণে আরগুলো মরে চেঁচাইয়া।”[১১৭]

তাড়কা ও মারীচের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে মিথিলার যজ্ঞে যোগদানের জন্য ও সেখানকার রাজা জনকের বিখ্যাত ধনুক দেখাবার জন্য বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার পথে যাত্রা করার সময় থেকে উপেন্দ্রকিশোর আবার লঘু ত্রিপদীতে কাহিনী বর্ণনা করেন তবে এক্ষেত্রে তিনি আবার অতিপর্ব যুক্ত করেছেন যাতে গতিটা একটু দ্রুত হয় (শিশুদের চঞ্চল মনের উপযুক্ত) ঠিক এইরকম —

“তখন সবাই মিলে যান মিথিলায়
বোঝাই দিয়ে গাড়ি,
সেথায় যজ্ঞ হবে জবর জাঁকাল
জনক রাজার বাড়ি
আছে ধনুক সেথায় কেউ নাকি তায়
গুন পরাতে নারে,
শুনে মুনির সাথে দুভাই সুখে
দেখতে চলে তারে।”[১১৮]

তবে রামায়ণ আখ্যানের ক্ষেত্রে দেখা যায় মিথিলায় যাওয়ার পথে বেশ কিছু জায়গায় তারা রাত্রি যাপন করেন এবং বিশ্বামিত্র মুনি তাদের সেইসব জায়গার ইতিহাস শোনান। ‘ছেলেদের রামায়ণে’ সেই ইতিহাসের কথা না থাকলেও জায়গার নাম গুলো ছিল কিন্তু সেই সব স্থানের নাম পদ্য আকারের রামায়ণে উপেন্দ্রকিশোর কিছুই উল্লেখ করেন নি সরাসরি চলে গেছেন গৌতম মুনির আশ্রমে অহল্যার প্রসঙ্গে আবার অহল্যার কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা করলেও অহল্যার অপরাধের কথা কিছু বলেন নি। শুধু তায় নয় ‘ছেলেদের রামায়ণে’ গৌতমের পুত্র, জনকের পুরোহিত শতানন্দ মুনির কথা উল্লেখ করলেও এখানে তা উল্লেখ করেন নি। শুধু রামের পদার্পণে অহল্যার শাপমোচন ও গৌতমের ঘরে ফিরে আসার আনন্দের মধ্য দিয়ে ফার অতিপর্বযুক্ত লঘু ত্রিপদী ছন্দের শেষ করেন তিনি—

“কত সবুজ মাঠে, নদীর তীরে
পথ গিয়েছে ঘুরে,
আহা, শূন্য পরে তাহার ধারে
এ কোন মুনির কুঁড়ে?
... .
চল, তোমায় দেখে এবার তিনি
উঠুন সুখী হয়ে।

....

কুটির উজ্জ্বল করি উঠেন দেবী

রামের দেখা পেয়ে।

... ...

গৌতম এলেন ঘরে সেই সময়ে

এলেন ততক্ষণ,

আবার দুজনে মিলে হরির পূজায়

দিলেন তাঁরা মন।”[১১৯]

আবার দেখি যে মিথিলায় প্রবেশের সময় হতেই তিনি পদ্যের গতি পরিবর্তন করে দেন এইরকম ভাবে—

“সেথা হতে মিথিলায় যান তিনজন,

দু ভায়ে দেখিয়ে ভোলে সকলের মন।

জনক বলেন, “আহা কেমন সুন্দর!

কাহার কুমার এরা কহ মুনিবর।”

মুনি বলেন, “দশরথ রাজা অযোধ্যার,

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এরা তাঁহার কুমার।”[১২০]

এরপর থেকে অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণের তারকা ও মারীচ বধের কথা জনককে জানানো এবং শিবের ধনুক দেখা ও তাতে গুন দিয়ে হরধনু ভঙ্গের কথা, সীতার জন্ম বৃত্তান্ত, দশরথের চার পুত্রের সাথে জনক ও তার ভাইয়ের চার কন্যার বিবাহ ও বিবাহের নানা আনন্দ উৎসবের কথা বর্ণনা ও তাদের বিদায় পর্যন্ত বর্ণনা হয় এই একই গতিতে অর্থাৎ এখানে গতি দ্রুত আনন্দ কোলাহল ছুটছুটির মতন। আবার দেখি যে মিথিলা ছাড়ার সময় থেকে পদ্যের গতি পরিবর্তন হয়, দেখা যায় পূর্বের মত অতিপর্বযুক্ত লঘু ত্রিপদী।

ধনুক ভাঙার বর্ণনা —

“সে ধনুকে যদি রাম পারে গুণ দিতে,

সীতার বিবাহ দিব তাহার সহিতে।”

....

না জানি কতই ভারি ছিল ধনুখানি!

অনেক হাজার লোকে আনে তারে টানি।

ভয়ঙ্কর সেই ধনু তুলি বাম হাতে,

হাসিতে হাসিতে রাম গুণ দেন তাতে।”[১২১]

রাম-সীতার বিবাহের বর্ণনা—

“পত্র পান দশরথ বসিয়া সভায় —

“শ্রীরাম-সীতার বিয়ে এস মিথিলায়।”

....

শুন কি সুন্দর কথা হইল তখন।

সেথা ছিল চারি কন্যা লক্ষ্মীর মতন।

ঊর্মিলা নামেতে কন্যা জনক রাজার,

ভাইঝি মাণ্ডবী তাঁর, শ্রুতকীর্তি আর।

সীতারে লইয়া তারা হয় চারিজন,

চারি পুত্র দশরথ রাজার তেমন।

মুনিগণ বলে, “আহা, কিবা চমৎকার,

মেয়ে নাই হেন কোনোখানে আর।

....

তখন মিথিলাপুরী করে টলমল,

কি আনন্দ, কত গান, পূজা কোলাহল।

....

অগ্নির সম্মুখে বসি জনক তখন,

চারি বরে কন্যা দেন করিয়া যতনে।”[১২২]

মিথিলা ছাড়ার সময়ের বর্ণনা—

“মহারাজ দশরথ ছেলে বউ নিয়া,

মনের সুখেতে যান বিদায় লইয়া।

নিয়ে বউ সকলে মনের সুখে

চলেন সবাই ঘরে,

তখন　পথের মাঝে　　　কাঁপেন তাঁরা

পরশুরামের ডরে।”[১২৩]

এবং এই অতিপর্বযুক্ত লঘু ত্রিপদীর সাহায্যেই উপেন্দ্রকিশোর পরশুরামের সঙ্গে রামের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জয়লাভের পর বউ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসার বর্ণনা করেন অর্থাৎ আদি কাণ্ডের শেষ অংশ পর্যন্ত এই গতি বজায় থাকে—

“শ্রীরাম　ধনুক নিয়ে　　　অমনি তাতে

দিলেন টেনে গুণ,

পরে　বাণটি হাতে　　　নিতেই মুনির

মুখ তো হল চুন!

....　....　....

ঠাকুর　হার মেনে তায়　　　সেখান হতে

গেলেন লাজের ভরে,

রাজা　সবায় নিয়ে　　　মনের সুখে

এলেন আপন ঘরে।

তখন　আদর করে　　　রানীরা সবে

বউ লইলেন কোলে,

....　....　....

পরে　ভরত গেলেন　　　মামার বাড়ি

শত্রুঘ্নরে লয়ে,

আর　শ্রীরাম করেন　　　পিতার সেবা

পরম সুখী হয়ে।”[১২৪]

অযোধ্যাকান্ড

অযোধ্যাকান্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, অযোধ্যাকান্ডের সূচনা করেন উপেন্দ্রকিশোর খানিকটা মধ্যমগতির মধ্য দিয়ে এই ভাবে—

“বয়স হইল ষাট হাজার বছর,

চলিতে কাঁপেন, ‘রাজা করি থর্-থর্।
ভাবিলেন তাই, ‘মোর বল গেছে টুটি,
রামেরে বুঝায়ে কাজ আমি লই ছুটি।’
তখন বলেন রাজা, “শুন সভাজন,
যুবরাজ কর মোর রামেরে এখন।”[১২৫]

তারপর রামের যুবরাজ হওয়ার খুশিতে অযোধ্যাবাসীর আনন্দ ব্যক্ত করেন এই রকম ভাবে—

“সুন্দর বসন পরি সাজিল সকলে,
আনন্দে ধুইল মুখ চন্দনের জলে।
মনের সুখেতে তারা করে গণ্ডগোল,
‘ডিম্বি-ডিম্বি’ ‘তাই-তাই’ বাজে ঢাক ঢোল।”[১২৬]

আবার রামের যুবরাজ হওয়ার সংবাদে কৌশল্যা, অযোধ্যাবাসীর আনন্দের পাশাপাশি কুটিল কুঁজীর হিংসার বর্ণনাও পদ্য আকারে করেন চমৎকার ভাবে—

“হিংসায় কুঁজীর কুঁজ করে টন্‌টন্!
কৈকেয়ীর কাছে গিয়া তখনি সে কয়,
“শোনো, শোনো! আজি রাম যুবরাজ হয়!”[১২৭]

ভালোমানুষ কৈকেয়ীর মন কী ভাবে বিষিয়ে দেয় কুটিল কুঁজী তার বর্ণনা ও বিষাক্তা কৈকেয়ীর কথার জালে দশরথকে বন্দী করে রামকে বনে পাঠানো ও ভরতকে রাজা করার সমস্ত বৃত্তান্তই চমৎকার ভাবে পদ্যে তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রকিশোর একই লয়ের মধ্য দিয়ে—

“ভালো মন্দ কিসে হয়, নাহি জানো বুঝি!
কুটিল কৌশল্যা রানী রাজার মা হলে,
হেঁট মুখে রবে তুমি তার পদতলে।
রাম রাজা হলে তোর ভরতে মারিবে,
তখন তোমার দশা ভাব কি হইবে।”
....
কুঁজী বলে, “ভয় নাই, হবে সেই কাজ

দুই বর তোরে যদি দেয় মহারাজ।”

....

তখন বলেন রাজা, “কি চাই তোমার?

এখনি পাইবে তাহা, বল একবার।”

শুনিয়া কৈকেয়ী তারে নাকি সুরে কয়,

“সত্য করি বল আগে, দিবে তা নিশ্চয়।”

রাজা কন, “দিব, দিব, দিব তা তোমারে।”

....

শুনিয়া কৈকেয়ী কয়, “আর কিছু নয়

ভরতেরে যুবরাজ কর মহাশয়।

চৌদ্দ বছরের তরে রাম বনে যাবে,

পরিয়া গাছের ছাল ফল মূল খাবে।”[১২৮]

এরপর দশরথের রাগমিশ্রিত বেদনা, কৌশল্যার কষ্ট, লক্ষ্মণের ক্রোধ, সীতার মিনতী, অযোধ্যা বাসীর দুঃখ, রামের বনবাস, দশরথ ও অযোধ্যাবাসীর রামের পিছু পিছু গমন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের আগমন সমস্ত ঘটনায় একই তাল লয়ে বর্ণনা করেছেন।

তবে ভরতের আগমনে কুঁজীর আনন্দ ও তারপর কুঁজীর বিপদজনক অবস্থার কথা চমৎকার রোমাঞ্চকর ভাবে উপস্থাপন করেছেন উপেন্দ্রকিশোর—

“কুঁজী ভাবে, পায় জানি কিবা পুরস্কার,

যত ভাবে, তত কুঁজ উঁচু হয় তার।

মুখ ভরা হাসি আর গাল ভরা পান,

মাকড়ির ভারে যেন ছিঁড়ে দুই কান!

....

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিল সখীদের সাথে,

দরোয়ান ধরে দিল শত্রুঘ্নের হাতে।

শত্রুঘ্ন বলেন, “ভালো পাইলাম দেখা—

আজি কিছু সাজা তোর কপালেতে লেখা।"

চুল ধরি পরে যেই দিলেন আছাড়,

ভেড়ার মতন কুঁজী ডাকে চমৎকার।

....

ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি পলাইল ছুটি,

বাতাসেতে ফড়্ফড়্ উড়ে তার ঝুঁটি!"[১২৯]

শেষে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের যাত্রা, রামকে না আনতে পেরে রামের খরম নিয়ে এসে ভরতের রাজ্য পরিচালনা করতে বসা পর্যন্ত অর্থাৎ অযোধ্যা কান্ডের শেষ পর্যন্ত একই লয়ে উপেন্দ্রকিশোর কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায় একই গতিতেই উপেন্দ্রকিশোর অযোধ্যা কান্ডের বর্ণনা করে গেছেন। পদ্য আকারে হলেও অযোধ্যা কান্ডের প্রায় সমস্ত ঘটনায় তিনি বর্ণনা করেছেন দু'একটা কথার মধ্য দিয়ে, কিছুই প্রায় বাদ দেন নি। এই কান্ডে অনেক দুঃখের অংশ থাকায় বা এই কান্ডটি একটু গুরুগম্ভীর কান্ড থাকার ফলেই হয়তো সমগ্র কান্ডটিকে একই লয়ের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করে গেছেন উপেন্দ্রকিশোর।

অযোধ্যাকান্ডের প্রায় সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করার পরও পদ্যের আকারে রচিত হওয়ার ফলে উপেন্দ্রকিশোর যে সমস্ত দু'-একটা কথা 'ছোট্ট রামায়ণে'র অযোধ্যাকান্ড থেকে বাদ দিয়েছেন সেগুলি হল—

১। তমসা নদীর তীর থেকে রামের অযোধ্যা বাসীকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছোট্ট রামায়ণে থাকলেও রাম, রথের চাকা দিয়ে যে পথ বিভ্রাট ঘটিয়ে ছিলেন তা 'ছোট্ট রামায়ণে' নেই।

২। ভরতের সৈন্যদের জন্য ভরদ্বাজ মুনির ভুড়িভোজের আয়োজনের কথা থাকলেও 'ছেলেদের রামায়ণে'র মত পায়েসের দিঘি বা সরবতের নদীর কথা ছিল না 'ছোট্ট রামায়ণে'।

৩। দশরথের মৃত্যুর সংবাদ শুনে মন্দাকিনী নদীর ধারে রামের তর্পণ করার কথা ছোট্ট রামায়ণে নেই।

৪। অযোধ্যা কান্ডের শেষে ভরতকে বিদায়ের পর রামের চিত্রকূট পর্বত ছেড়ে অতি ও অনসূয়ার আশ্রমে আসার কথা অর্থাৎ অতি-অনসূয়ার কথা 'ছোট্ট-রামায়ণে' নেই।

অরণ্যকান্ড

অরণ্যকান্ডের সূচনা করেন উপেন্দ্রকিশোর একাবলীর ধাচে একইভাবে পাঁচালীর সুরে—

"তার পরে সীতা আর লক্ষ্মণেরে নিয়া

দণ্ডক বনেতে রাম গেলেন চলিয়া।"[১৩০]

এবং অরণ্যকান্ডের শুরুতেই বিরাধ রাক্ষসের বর্ণনা করেন চমৎকার শিশু সুলভ ভাবে—

"বিরাধ বলিয়া থাকে রাক্ষস সেথায়,

না বিঁধে ব্রহ্মার বরে অস্ত্র তার গায়।

খিঁচাইয়া রাখে দাঁত পথ-ঘাট জুড়ি।

কড়্মড়ি হাতি খায়—এই বড় ভুঁড়ি!"[১৩১]

বিরাধ রাক্ষসের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধের বর্ণনা ও তারপর দশটি বছর বিভিন্ন মুনিদের আশ্রমে ঘুরে বেড়ানো, তারমধ্যে জটায়ু পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তারপর গোদাবরী তীরে তাদের সুখে বসবাস এই পর্যন্ত কাহিনী এই একই ধাঁচে বর্ণিত হয়েছে।

এরপরে সূর্পনখা রাক্ষসীর প্রসঙ্গ আসে অর্থাৎ রাবণের আওতায়। এখানেও এই একাবলীর ধাচে পাঁচালীর সুর থাকলেও একটি পংক্তি বাদে বা আলাদা প্যারা করে কাহিনী শুরু হয় এই রকম—

"সেই পঞ্চবটী বনে, সুন্দর কুটিরে,

সুখেতে থাকেন তারা গোদাবরী তীরে।

হেনকালে কি হইল শুনহ সকলে—

রাক্ষসী আইল সেথা সূর্পনখা বলে।"[১৩২]

লক্ষ্মণ এই সূর্পনখা রাক্ষসীর নাক-কান কাটায়, শত শত রাক্ষস সেখানে আসলে তার বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর করেন এইরকম ভাবে—

"রাক্ষসের ডাকে বন কাঁপে থর্‌থর্‌।

দেখিতে দেখিতে তারা, খাঁড়া ঢাল নিয়া,

হাজারে-হাজারে সেথা আইল ছুটিয়া।

শ্বাস ফেলি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ভেঙচায় রাগে,

দাঁত কড়্মড়ি শুনি বড় ডর লাগে!

লাঠি-গদা, শেল শূল, কুড়াল কাটারি,

রোষেতে ছুঁড়িয়া তারা মারে ভারী-ভারী।"[১৩৩]

এইসব রাক্ষসদের রাম এক নিমেষের মধ্যে মেরে ফেলায় যে রাক্ষসটি শুধু প্রাণে বেঁচেছিল অর্থাৎ অকম্পন, সেই অকম্পন ছুটে গিয়ে ভয়ে রাবণকে যে সমস্ত কথা বলে তা হল এইরকম—

“রাবণেরে কয় কাঁপি, ‘হেই মোহারাজ!

আরে তোর খরটি তো মরিলেক আজ!

দুসনিয়া ফুসনিয়া যেতো মাল ছিলো,

সবেক মানুসো বেটা রামা কাটি দিলো!”

পরেতে আসিয়া সেই নাককাটি বুড়ি

হাই-মাই করি সেথা কাঁদে মাথা খুঁড়ি।”[১৩৪]

আর এইখানে উপেন্দ্রকিশোরের কৃতিত্ব আরও চমৎকার। যেমন—অকম্পন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাবণকে এই সংবাদ দিয়েছে বলে তার মুখ দিয়ে আর মহারাজ বেরোয় নি, বলেছে- মোহারাজ। আসলে ভয় পেয়ে যখন আমরা কথা বলি তখন আমরা আর শুদ্ধ ভাষা বলতে পারি না, নিজের নিজের গ্রাম্য ভাষাই চলে আসে। রাক্ষস অকম্পনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাই এই অংশের বর্ণনাটি শুদ্ধ ভাষায় নয় গ্রাম্য ভাষায়। ফলে স্বভাবতই এই অংশটি হয়েছে আরও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

এই ঘটনার পরে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রসঙ্গ আসায় অর্থাৎ রাবণের সশরীরী যোগ ঘটায় এখান থেকে গতি হয় পরিবর্তন, দেখা যায় লঘু ত্রিপদী—

“লাফায়ে তখন উঠিল রাবণ

রাগেতে আগুন হয়ে,

সারথিরে কয়, “আয় তো রে মোর

গাধাটানা রথ লয়ে!”

সেই রথে চড়ি চলিল রাবণ

যেথায় মারীচ থাকে,

বলে, “চল যাই রামের নিকটে

সাজা দিব আজ তাকে।”[১৩৫]

এখান থেকে শুরু করে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষন রাবণের সশরীরী যোগ থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই একই গতিতে, লঘু ত্রিপদীতে কাহিনী বর্ণিত হয়। তবে সীতা হরণের সময় রাবণের চেহারার চমৎকার বর্ণনা করেন উপেন্দ্রকিশোর—

“কুড়ি চোখ তায় ঘুরায় রাবণ

রাগেতে পাগল হয়ে,

বিশ পাটি দাঁত কড়ি কড়্মড়্

চলে রে সীতায় লয়ে।"[১৩৬]

তারপর কুটিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে রামের ক্রন্দন ও সীতার অন্বেষণ, জটায়ুর মৃত্যু, রাক্ষস কবন্দের সঙ্গে রামের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের বার্তা ইত্যাদি বর্ণিত হয় আগের মতোই একাবলীর ধাচে অর্থাৎ দীর্ঘ কাহিনীর দ্রুত বর্ণনা।

কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডটিতে মূলত আছে বানরদের কথা। রাম-লক্ষ্মণের সাথে বানরদের সাক্ষাৎ অর্থাৎ সুগ্রীব, বালী ও হনুমানের সঙ্গে দেখা ও তারপর তাদের দ্বারা সীতা অন্বেষণের প্রস্তুতি ও সীতা অন্বেষণ অর্থাৎ মোটামুটি একটাই প্লট। ফলে আমরা দেখতে পাই সমগ্র কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডটি বর্ণিত হয়েছে একই ভাবে একাবলীর ধাচে ও পাঁচালীর মেঠো সুরে। সূচনার অংশটি এই রকম—

"তারপর পম্পা নদী পার হয়ে শেষে

আসিলেন দুই ভাই বানরের দেশে।

বানর কতই সেথা থাকে ভারী-ভারী,

পর্বত ছুঁড়িয়া মারে লম্বা লেজ নাড়ি।

রাজা তার বড় বীর, বালী নাম ধরে,

সুগ্রীব তাহার ভাই, কাঁপে তার ডরে।"[১৩৭]

একই গতিতে হলেও সমগ্র কান্ডটিকেই উপেন্দ্রকিশোর বিরামহীন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তবে কোন কোন অংশের শ্রুতি সৌন্দর্য আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে যেমন—হনুমানের বর্ণনায়—

"বড়ই পণ্ডিত হনু, ভারি বুদ্ধিমান,

হাসি-হাসি কথা কয়, মধুর সমান।

রামেরে করিল সুখী মিষ্ট কথা কয়ে,

কাঁধে করে গেল পরে দুজনেরে লয়ে।"[১৩৮]

আবার সুগ্রীব যখন রামকে বালীর বীরত্বের কাহিনী শোনান সেই অংশের বর্ণনাও দারুন কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে উপেন্দ্রকিশোরের ভাষায়—

"সুগ্রীব কহিল, "মিতা, বড় ভয় পাই,

বালীর সমান বীর কোথাও যে নাই।

দুন্দুভি দানবে বালী ফেলে দিল ছুঁড়ে,

যোজন দূরেতে এসে পড়িল সে উড়ে।

ঐ দেখ পড়ে সেই দুন্দুভির হাড়,

দেখ, তায় কত বড় হয়েছে পাহাড়।

হেসে বালী শালগাছ ফোঁড়ে শূল দিয়া,

পর্বতের চূড়া লয়ে খেলে সে লুফিয়া।”[১৩৯]

বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের যুদ্ধের বর্ণনাও উপেন্দ্রকিশোর করেছেন চমৎকার ভাবে—

“দুজনে বিষম যুদ্ধ হল তারপর,

কিবা তার লাথি কিল আঁচড় কামড়।

টিপ্, ঠাস্, ধপ্, খট্, ঘোঁৎ, ঘোঁৎ, হুপ, ধাঁই,

কত শব্দ হল তায়, শেষ তার নাই।”[১৪০]

এইভাবে সমগ্র অংশটিকে বর্ণনা করে উপেন্দ্রকিশোর শেষ করেছেন হনুমানের মহেন্দ্র পর্বত থেকে সমুদ্র পার হওয়ার প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে—

“চুপ করে ছিল হনু বসে একধারে,

সাগর ডিঙ্গাতে কয় জাম্ববান তারে।

হনু বলে, “চল যাই মহেন্দ্র পর্বতে

সাগর ডিঙ্গাতে লাফ দিব সেথা হতে।”[১৪১]

সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করার পরও উপেন্দ্রকিশোর ‘ছেলেদের রামায়ণ’ থেকে ‘ছোট্ট রামায়ণ’ -যে দুটি কাহিনী বাদ দিয়ে গেছেন সে দুটি হল—

১। সুগ্রীব যে কৃতিত্বের সাথে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী দলে দলে বানরদের বিভক্ত করে সীতা অন্বেষণের জন্য পাঠান, সুগ্রীবের সেই কৃতিত্বের কথা ও তার ফলে সমগ্র পৃথিবীর যে চমৎকার বর্ণনা উঠে আসে তা এইখানে উল্লেখ করা হয় নি। ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে—

“দেশে-দেশে ফিরি তারা খুঁজিল সীতারে,

পর্বতে নগরে বনে সাগরের পারে।

খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পুবে পশ্চিমে উত্তরে,

কোথাও না পেয়ে তাঁরে ফিরে এল ঘরে।

দক্ষিণের লোক ফিরে আসে নি কেবল,

সেথা গেছে হনুমান লয়ে তার দল।”[১৪২]

২। সীতার অন্বেষণ করতে করতে হনুমানের দলের, ময় দানবের মায়াবী পুরীর মধ্যে যাওয়ার ঘটনা ও সেখান থেকে উদ্ধারের কাহিনী উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ‘ছোট্ট রামায়ণে’ উল্লেখ করেন নি। বলেছেন এইভাবে—

“খুঁজেছে নদীর তীরে, পর্বত উপরে,

ঘন বনে, অন্ধকার গুহার ভিতরে।

কোথাও সীতার দেখা না পাইয়া তারা

সাগরের ধারে আসি কেঁদে হল সারা।”[১৪৩]

সুন্দরকান্ড

গদ্য আকারের চাইতে পদ্য আকারের রামায়ণে চমৎকার ভাষা ব্যবহারের দ্বারা রামায়ণ পাঠের অনুভূতি আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। আর তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায় সুন্দর কান্ডের সূচনার পংক্তি গুলির মধ্যেই—

“হনুমান বড় বীর, ডিঙ্গাবে সাগর,

কিচির-মিচির করে যতেক বানর।

ফুলিয়া হইল হনু পর্বতের মতো,

গুছায়ে লইল গায় জোর ছিল যত।

তারপরে দুই পায়ে যেই দিল ভর,

পর্বত নিঙাড়ি জল ঝরে ঝরঝর।”[১৪৪]

— ‘গুছায়ে লইল গায় জোর ছিল যত’ এই পংক্তিটি অনুভব করলেই তা যথার্থভাবে আমরা বুঝতে পারি।

সুন্দরকান্ডের সমগ্র অংশে বীর হনুমানের নানা চমৎকার মজাদার কাহিনী থাকায় এই কান্ডটিকে উপেন্দ্রকিশোর বর্ণনা করেছেন অনেকটা কৌতুকবোধের দ্বারা যেমন—সুন্দরকান্ডের সূচনায় হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় পথমধ্যে নাগমাতা সুরমার সঙ্গে তার সংঘর্ষের বর্ণনা—

“সুরসা নাগের মাতা, যে-সে কেহ নয়,

পৃথিবী গিলিতে পারে যদি মনে লয়।

হাঁ করে আইল সে সুরসা নাগিনী,

হনুমান বলে, “বাবা! না, জানি কে ইনি!”[১৪৫]

সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় প্রবেশের আগে আকাশ থেকে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেন উপেন্দ্রকিশোর এমন করে—

"লঙ্কার সোনার পুরী দেখে তার পরে,
ঝলমল করে তাহা জলের উপরে।
হনু ভাবে, 'বড় হয়ে যদি সেথা যাই,
রাক্ষসে করিবে দেখি ভারি কাঁই-মাঁই।"[১৪৬]

এবং লঙ্কায় প্রবেশের সময় বিরাটাকার রাক্ষসীর সাথে তার যুদ্ধের বর্ণনা এইরকম—

"গালি দিল দুশো দাঁত করি কড়্মড়্,
তালগাছপানা হাতে কষে দিল চড়।
হনু তারে এক কিল দিল বাম হাতে,
পড়িল রাক্ষসী মুখ সিঁটকায়ে তাতে।"[১৪৭]

আবার দেখি যে, উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার কৌতুকবোধেরদ্বারা বর্ণনা করেছেন অশোক বনের রাক্ষসীদের সাথে হনুমানের মারামারির ঘটনা—

"জয় রাম! জয় রাম!" হাঁকে হনুমান।
রাক্ষসের মাথা পড়ে হয়ে খান্-খান্।
হাতি দিয়া হাতি মারে, ঘোড়া দিয়ে ঘোড়া,
রাক্ষসে রাক্ষস ঠোকে লয়ে জোড়া-জোড়া
জাম্বুমালী, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর,
দুর্ধর প্রঘসে মারি করে চুরমার।
যুপাক্ষের হাড় ভাঙে শাল গাছ দিয়া,
অক্ষেরে করিল গুঁড়া সানে আছাড়িয়া।"[১৪৮]

তারপর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের সংঘর্ষ ও তার পরবর্তী ঘটনাও বেশ উপভোগ্য—

"বড় ছেলে ইন্দ্রজিতে পাঠাল রাবণ।
বড় শঠ সেই বেটা, ভারি ফন্দি জানে,
ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধিল আসি বীর হনুমানে।
হনু ভাবে, 'লয়ে যাক রাবণের কাছে,

দেখে নিব, পেটে তার কত বিদ্যা আছে।’

....

তায় কি হইল, সবে শুন মন দিয়া—

ব্রহ্মাস্ত্র খুলিয়া গেল দড়িতে ঠেকিয়া।

দড়ি ঠেকাইতে কভু না হয় সে বাণে,

অবোধ রাক্ষসগণ তাহা নাহি জানে।

হাততালি দিয়া তারা হাসে খিলি-খিলি,

“হেঁইয়ো, হেঁইয়ো!” বলি টানে সবে মিলি।

চিমটি কাটিছে কত কি হবে তা কয়ে,

এই মতে রাবণের কাছে গেল লয়ে।”[১৪৯]

এবং শেষে রাবণের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাতের বিবরণটি এই রকম—

“সীতাকে ফিরায়ে যদি না দেয় রাবণ,

কাটিবেন মাথা তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।”

ঘুরায়ে কুড়িটা চোখ বলিছে রাবণ,

“কাট্ তো রে অভাগারে, কাট্ এইক্ষণ।”[১৫০]

লঙ্কায় অনেক উপদ্রব করে লঙ্কা ভেঙ্চুরে পুরিয়ে ছারখার করে দেওয়ার পর যখন হনুমান আবার সমুদ্র পার হয়ে নিজের দেশে ফিরে আসে তার বর্ণনা করেন উপেন্দ্রকিশোর এইরকমভাবে—

“আবার পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার,

সাগর ডিঙায়ে হনু দলে ফিরে তার।”[১৫১]

— আর ‘সাগর ডিঙায়ে হনু দলে ফিরে তার’ এই পংক্তির মধ্য দিয়ে যেন আমরা ঘরে ফেরার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। এত বর্ণনা সত্ত্বেও যে সমস্ত ঘটনা ‘ছোট্ট রামায়ণে’র সুন্দরাকান্ড থেকে বাদ পরে যায় সেগুলি হল—

১। রাবণের সুন্দর রাজপুরীর বর্ণনা এখানে নেই। রাজপুরীর ভেতরের, রাবণের শয়ন গৃহের ও রান্নাঘরের যে চমৎকার বর্ণনা আছে তা এখানে উল্লেখ করেননি উপেন্দ্রকিশোর।

২। রাক্ষসীরা সীতাকে ভৎর্সনা করলে, ত্রিজটা বুড়িরাক্ষসী, তাঁর যে দুঃস্বপ্নের কথা বলেন অর্থাৎ রাক্ষসদের পরাভবের সেই কথা এই সুন্দরকান্ডে নেই।

৩। হনুমানকে দেখে, প্রথমে সীতার হনুমানকে অবিশ্বাস করার ঘটনা এইখানে নেই।

৪। হনুমানের লেজে কাপড় জড়ানোর সময় হনুমানও যে তার লেজ বড় করেই যাচ্ছিল আর তার ফলে লঙ্কা ছেড়া কাপড়ও শেষ হওয়ার কথা, এই বর্ণনা 'ছোট্ট রামায়ণে' নেই।

৫। রাবণের সীতাকে প্রলোভিত করার কোন কথাই 'ছোট্ট রামায়ণে' উপেন্দ্রকিশোর উল্লেখ করেন নি।

লঙ্কাকান্ড

লঙ্কাকান্ডের সূচনা করেন উপেন্দ্রকিশোর বেশ রসিয়ে-কসিয়ে পাঁচ চরনের স্ববকের দ্বারা ছন্দ বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এইরকম ভাবে—

"তারপরে মিলিয়া সকলে,
লঙ্কায় চলিল দলে-দলে,
গণিয়া না হয় শেষ, ধূলায় ছাইল দেশ
আকাশ ফাটিল কোলাহলে।
সভা মধ্যে বসিয়া রাবণ
বলিছে, "কহ তো সভাজন,
একেলা বানর আসি সকলই যে গেল নাশি,
উপায় কি হইবে এখন?"[১৫২]

আগের অংশগুলি থেকে ছন্দ বৈচিত্র্যে এই কান্ডের প্রথম অংশটি যেন সম্পূর্ণই আলাদা স্বাদ দেয়।

রামের বিশাল বানর সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় আসার বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর এখানে করেন একটু অন্যরকম ভাবে, তবে পদ্যের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে—

"লঙ্কাপুরী ছাইল বানরে।
কাঁপে মাটি তাহাদের ভরে।
কে কবে এসেছে কত? গাছে পাতা নাই তত,
দেখিয়া রাবণ কাঁপে ডরে।"[১৫৩]

এখানে উপেন্দ্রকিশোর বিশাল বানর সৈন্যকে 'গাছের পাতা'র সঙ্গে তুলনা করে চমৎকারভাবে দুটি শব্দের মধ্য দিয়েই যেন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বিশাল বানর সেনা বাহিনীকে।

আবার দেখি, যে সমস্ত অংশ, রাক্ষস সৈন্যদের মুখ দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর তুলে ধরেছেন সেই সমস্ত অংশের ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি গ্রাম্য ভাষায় এইভাবে—

"সবে কয়, "কেনে কর ডর?
লাখো মাল বান্ধিবে কোম্বর,
হেথের লিবেক ভারী, বান্দর দিবেক মাঝি,
তুই থাক বসে গদ্দিপর!"[১৫৪]

আর এর পরের অংশেই আবার বিভীষণের মুখের ভাষা শুদ্ধ, এই রকম (যেহেতু সে রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণ) —

"সেইখানে ছিল বিভীষণ,
বিনয়ে সে কহিল তখন,
"সীতারে রাখিলে ধরে, সকলে মরিব পরে,
ফিরায়ে দেহ গো এইক্ষণ!"[১৫৫]

ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের মাধ্যমে চমৎকার ভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই অংশটিকে উপেন্দ্রকিশোর।

এইভাবে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পাঁচ চরনের স্তবকের দ্বারা সূচনার অংশটিকে উপেন্দ্রকিশোর বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, দেখা যায় যে রাবণের সশরীরী যোগ থাকা পর্যন্তই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তিনি।

রাবণকে বিভ্রান্ত করার পর যখন রাবণের নির্দেশে লঙ্কার অন্যসকল রাক্ষসদের সঙ্গে রামের সৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয় সেই অংশ থেকে আবার পাঁচ চরণের স্তবকের পরিবর্তে দেখা যায় একাবলীর তালে এই ভাবে —

"তখন হইল যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর,
না জানি মরিল কত রাক্ষস বানর।
দিন নাই, রাত নাই, করে কাটাকাটি,
রক্তেতে বহিল নদী, লাল হল মাটি।
"মার্-মার্", "কাট্-কাট্" মহা গণ্ডোগোল,
অস্ত্র করে ঝন্ঝন। বাজে ঢাক ঢোল"।[১৫৬]

রাবন পুত্র ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ পদ্ধতির কথাও উপস্থাপন করেন উপেন্দ্রকিশোর একইভাবে —

"তাহে দুষ্ট ইন্দ্রজিত পেয়ে বড় ডর,
মেঘে লুকাইয়া যুদ্ধ করে তারপর।
শুন বলি হল তায় কি সর্বনাশ,
চোর বেটা মারে বাণ নামে নাগপাশ!

বড়-বড় অজগর ছুটে এল তায়,

বিষম জড়াল রাম লক্ষ্মণের গায়।”[১৫৭]

আমরা দেখি উপেন্দ্রকিশোরের চমৎকার বর্ণনার কৌশলে গদ্যের চেয়ে পদ্য আকারের রামায়ণেই, রামায়ণ কাহিনীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে, যেমন গরুড় পাখির বর্ণনা—

“কাঁদিতেছে সকলে রাম লক্ষ্মণে ঘিরিয়া।

আইল গরুড় পাখি তখন সেথায়,

সাপেরে দেখিলে ধরে অমনি সে খায়।

জটায়ুর জ্যেঠা সে যে, ভারি ভয়ঙ্কর।

উড়িলে পর্বত কাঁপে, বড় বয় ঝা।

তারে দেখি অজগর দুভাইকে ছাড়ি,

‘বাপ।’ বলি পলাইয়া গেল তাড়াতাড়ি।”[১৫৮]

বানরদের যুদ্ধ করার কৌশলও উপেন্দ্রকিশোর বর্ণনা করেছেন দারুণভাবে —

“বড়ই বিষম যুদ্ধ বানরেরা করে,

রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।

থাপ্পড় লাগায় ভারি, ছিঁড়ে নাক কান,

গলায় জড়ায়ে লেজ কষে দেয় টান।”[১৫৯]

যুদ্ধে একে একে সব রাক্ষস বীর পরাভূত হওয়ার শেষে রাবণ নিজে তার সৈন্য সামন্তকে নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে—

“নিজেই আসিল তাই লয়ে লোকজন।

ইন্দ্রজিত, অতিকায় সাথে এল তার,

ত্রিশিরা, নিকুম্ভ, কুম্ভ মহোদর আর।

লাফায়ে বানর ধায় পর্বত লইয়া,

রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে।

রাগিয়া রাবণ মারে চোখা-চোখা বাণ,

পর্বত ভাঙিয়া তায় হয় খান্-খান্।

বড় যুদ্ধ করে বেটা ভূতের মতন,

আঁটিতে নাহিক তারে পারে কোনোজন।”[১৬০]

শেষে রামের কাছে পরাভূত হয়ে লজ্জায় ফিরে যায় বাড়ি এবং তারপর বীর ভাই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠানোর প্রস্তুতি করেন—

"কুম্ভকর্ণ ভাই হয় রাবণ রাজার,
ছুটিয়া পলায় যম দেখা পেলে তার!
...   .
ব্রহ্মা দিল বর, "শুধু ঘুমাইবে" বলে,
নাহিলে গিলিয়া বেটা খাইত সকলে।"[১৬১]

তবে মাঝে মাঝে যুদ্ধের বর্ণনা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যেমন — যুদ্ধের মাঝখানে হনুমানের কৈলাস পর্বত থেকে ঔষধ আনার বর্ণনা —

"হনুমান বলে, "আমি তায় নাহি ভুলি—
পর্বত মাথায় করে লয়ে যাব তুলি।"
এতেক বলিয়া রোষে বীর হনুমান,
পর্বত ধরিয়া দিল কষে এক টান।
চড়্‌চড়্‌ করি তায় এল তাহা উঠি,
মাথায় লইয়া তারে যায় হনু ছুটি।"[১৬২]

আর এইভাবে প্রায় সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা করেন উপেন্দ্রকিশোর এবং ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্যন্ত এই একাবলীর তালে একই ধাচে রামায়ণ পাঠ চলে।

তারপর আবার লঙ্কার সকল বীর যোদ্ধাদের একে একে পরাভবের পর পুনরায় রাবণের নিজেই যুদ্ধে যোগদানের সময় থেকে দেখা যায় লঘু ত্রিপদী—

"আর বীর নাই   রাবণের দেশে,
সকলে গিয়াছে মরে,
নিজেই তখন   চলিল রাবণ
সাজিয়া রাগের ভরে।
যতেক রাক্ষস   আছিল বাঁচিয়া
সবারে লইয়া সাথে,
দাঁত কড়্‌মড়ি   চলিল সকলে
হাতিয়ার লয়ে হাতে।"[১৬৩]

এবং এই সময় থেকে রামের হাতে রাবণের মৃত্যু এবং তার শ্মশান যাত্রা পর্যন্ত অর্থাৎ রাবণের সমস্ত যুদ্ধ বর্ণনা হয় এই লঘু ত্রিপদীতেই।

তারপর সীতার সঙ্গে রামের দেখা ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং সসম্মানের সঙ্গে রাম-সীতার অযোধ্যা যাত্রা, ইত্যাদির মধ্যে সমাপ্ত ঘোষিত হয় একাবলীর দ্বারা।

এবং শেষে কৌতুক বোধের দ্বারা রামের অভিষেকের বর্ণনা —

"তখন মিলিয়া সবে **সমাপ্ত** "রাম জয়-জয়" রবে
রাজা করে তাঁরে অযোধ্যায়।
পুরোনো নাপিত যারা ক্ষুরে শান দিয়া তারা
সাজিয়া আইল তাড়াতাড়ি,
রামের যতেক জট চেঁছে দিল চট্‌পট
যতনে কামায়ে দিল দাড়ি।"[১৬৪]

এবং অযোধ্যাবাসীর মনের মতন রাজা পাওয়ার মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'ছোট্ট রামায়ণ' রচনা শেষ করেন।

এত কিছু পরও দেখা যায় যে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'লঙ্কাকাণ্ড' থেকে কিছু কিছু ঘটনা বাদি দিয়েই গেছেন, যেমন —

১। সাগর পার হওয়ার জন্য রামের সাগর পূজা করা ও সাগর দেবের উপদেশের কথা 'ছোট্ট রামায়ণে'র 'লঙ্কাকাণ্ডে' নেই।

২। বিভীষণ রামের দলে যোগদান করলে, তখনই অর্থাৎ যুদ্ধ করতে লঙ্কায় যাওয়ার আগেই বিভীষণকে লঙ্কার রাজায়, রামের অভিষিক্ত করার কাহিনী 'ছোট্ট রামায়ণে' নেই।

৩। কুম্ভকর্ণ ঘুম থেকে উঠে, রাবণের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাকে যে উপদেশ দেন বা রাবণের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের যে সমস্ত কথাবার্তা হয়, তা উপেন্দ্রকিশোর 'ছোট্ট রামায়ণ' এ এক লাইনেই উল্লেখ করে গেছেন, এইভাবে —

"রাবণ সকল তারে কহিল যখন,
সে কহিল, "কেন কাজ করিলে এমন?"[১৬৫]

৪। মৃত সঞ্জীবনী ঔষধের গন্ধে বানর সৈন্যদের বেচে ওঠা সত্ত্বেও রাক্ষসদের না বেঁচে ওঠার যে কারণ ছিল, তা উপেন্দ্রকিশোর এখানে উল্লেখ করেন নি।

তথ্যসূত্র

১। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৪৬।

২। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৫।

৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫১।

৪। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৯।

৫। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫২।

৬। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৯।

৭। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৩৯।

৮। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৪০।

৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭০।

১০। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৫৫।

১১। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৫৬।

১২। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৮১।

১৩। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৩।

১৪। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২১১।

১৫। ঐ, পৃ-২১৭।

১৬। ঐ, পৃ-২২৮।

১৭। ঐ, পৃ-২৩৪।

১৮। ঐ, পৃ-২৩৭।

১৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৮৫।

২০। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৪।

২১। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৭৯।

২২। ঐ, পৃ-৩২৭।

২৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৪৬।

২৪। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৫।

২৫। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১০-১৩।

২৬। ঐ, পৃ-১৫।

২৭। ভট্টাচার্য হেমচন্দ্র (অনুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর-১৯৯৭, পৃ-৬৯-৭০।

২৮। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-৩৯।

২৯। ঐ, পৃ-৬৮।

৩০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫৫।

৩১। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৩।

৩২। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-৮৬।

৩৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৬০।

৩৪। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৫।

৩৫। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭১।

৩৬। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৫০।

৩৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭১।

৩৮। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৫০।

৩৯। ঐ, পৃ-১৫৯।

৪০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭৩।

৪১। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৯।

৪২। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৭১।

৪৩। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২০।

৪৪। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-১৭৬।

৪৫। ঐ, পৃ-১৮১।

৪৬। ঐ, পৃ-১৮৭।

৪৭। ঐ, পৃ-১৯৬।

৪৮। ঐ, পৃ-২২১।

৪৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৮৬।

৫০। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৪।

৫১। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৪৫।

৫২। ঐ, পৃ-২৫৩।

৫৩। ঐ, পৃ-২৬২।

৫৪। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯৩।

৫৫। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৮।

৫৬। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৬৩।

৫৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯৪।

৫৮। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৬৮।

৫৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯৫।

৬০। ঐ, পৃ-৩৯৫।

৬১। ঐ, পৃ-৩৯৯।

৬২। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-৩০৬।

৬৩। ঐ, পৃ-৩৭০।

৬৪। ঐ, পৃ-৩১১।

৬৫। ঐ, পৃ-৩১১।

৬৬। ঐ, পৃ-৩১৫।

৬৭। ঐ, পৃ-৩৬২।

৬৮। ঐ, পৃ-৩৮১।

৬৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৪২২।

৭০। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-৩৮৯।

৭১। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৪২৪।

৭২। ঐ, পৃ-৩৪৭।

৭৩। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৬।

৭৪। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৪৭।

৭৫। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংষদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৬।

৭৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫০।

৭৭। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৪।

৭৮। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫৭।

৭৯। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু ষাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৪।

৮০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫৭।

৮১।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৪।

৮২।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৫৯।

৮৩।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৫।

৮৪।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৬১।

৮৫।	ঐ, পৃ-৩৬৯।

৮৬।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৭।

৮৭।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭০।

৮৮।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-১৭।

৮৯।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৭২।

৯০।	ঐ, পৃ-৩৮৬।

৯১।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৫।

৯২।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯১।

৯৩।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৮।

৯৪।	রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯৩।

৯৫।	সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু ষাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-২৮।

৯৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৩৯৪।

৯৭। ঐ, পৃ-৩৯৯।

৯৮। বসু রাজশেখর (সারানুবাদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ-১৪১৮, পৃ-২৯১।

৯৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৪০৪-৪০৫।

১০০। ঐ, পৃ-৪০৬।

১০১। ঐ, পৃ-৪০৮।

১০২। ঐ, পৃ-৪১০।

১০৩। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৬৮৫।

১০৪। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৪২১।

১০৫। সরকার যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃ-৪৪।

১০৬। ঐ, পৃ-৪৫।

১০৭। ঐ, পৃ-৮৪।

১০৮। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা ১৪১৯, পৃ-৯৩৫।

১০৯। ঐ, পৃ-৯৩৬।

১১০। ঐ, পৃ-৯৩৫।

১১১। ঐ, পৃ-৯৩৫।

১১২। ঐ, পৃ-৯৩৫।

১১৩। ঐ, পৃ-৯৩৬।

১১৪। ঐ, পৃ-৯৩৬।

১১৫। ঐ, পৃ-৯৩৭।

১১৬। ঐ, পৃ-৯৩৭।

১১৭। ঐ, পৃ-৯৩৮।

১১৮। ঐ, পৃ-৯৩৯।

১১৯। ঐ, পৃ-৯৩৯।

১২০। ঐ, পৃ-৯৪০।

১২১। ঐ, পৃ-৯৪০।

১২২। ঐ, পৃ-৯৪১।

১২৩। ঐ, পৃ-৯৪২।

১২৪। ঐ, পৃ-৯৪৩।

১২৫। ঐ, পৃ-৯৪৪।

১২৫। ঐ, পৃ-৯৪৪।

১২৬। ঐ, পৃ-৯৪৪।

১২৭। ঐ, পৃ-৯৪৪।

১২৮। ঐ, পৃ-৯৪৫।

১২৯। ঐ, পৃ-৯৫২।

১৩০। ঐ, পৃ-৯৫৫।

১৩১। ঐ, পৃ-৯৫৫।

১৩২। ঐ, পৃ-৯৫৬।

১৩৩। ঐ, পৃ-৯৫৬।

১৩৪। ঐ, পৃ-৯৫৭।

১৩৫। ঐ, পৃ-৯৫৭।

১৩৬। ঐ, পৃ-৯৫৯।

১৩৭। ঐ, পৃ-৯৬২।

১৩৮। ঐ, পৃ-৯৬২।

১৩৯। ঐ, পৃ-৯৬৩।

১৪০। ঐ, পৃ-৯৬৪।

১৪১। ঐ, পৃ-৯৬৬।

১৪২। ঐ, পৃ-৯৬৫।

১৪৩। ঐ, পৃ-৯৬৫।

১৪৪। ঐ, পৃ-৯৬৬।

১৪৫। ঐ, পৃ-৯৬৭।

১৪৬। ঐ, পৃ-৯৬৭।

১৪৭। ঐ, পৃ-৯৬৮।

১৪৮। ঐ, পৃ-৯৭০।

১৪৯। ঐ, পৃ-৯৭০।

১৫০। ঐ, পৃ-৯৭১।

১৫১। ঐ, পৃ-৯৭১।

১৫২। ঐ, পৃ-৯৭২।

১৫৩। ঐ, পৃ-৯৭২।

১৫৪। ঐ, পৃ-৯৭২।

১৫৫। ঐ, পৃ-৯৭২।

১৫৬। ঐ, পৃ-৯৭৩।

১৫৭। ঐ, পৃ-৯৭৪।

১৫৮। ঐ, পৃ-৯৭৪।

১৫৯। ঐ, পৃ-৯৭৫।

১৬০। ঐ, পৃ-৯৭৫।

১৬১। ঐ, পৃ-৯৭৭।

১৬২। ঐ, পৃ-৯৮১।

১৬৩। ঐ, পৃ-৯৮৪।

১৬৪। ঐ, পৃ-৯৯১।

১৬৫।ঐ, পৃ-৯৭৮।